ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি

মহান ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই আমরা। ঠিক এই ছবিটিই এঁকেছে খুদে বন্ধু ফারহান আবদুল্লাহ। ও পড়ছে চতুর্থ শ্রেণিতে, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

মীর্জা মাহের আসেফ, দ্বিতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

তাসিন মুমস্বাদ, জুনিয়র ওয়ান, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

শেখ হাসিনার
১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ৬

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বন্ধুরা, তোমরা কি জানো উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি কি? হয়ত অনেকে জানো আবার অনেকে জানো না। বলছি, উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ-এর উন্নয়নে 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি। এর স্লোগান হচ্ছে– 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ/ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।' ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্র এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। বন্ধুরা, তোমরা জেনে খুশি হবে যে, দেশে প্রথমবারের মতো পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদনও শুরু হতে যাচ্ছে। বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ৪৯৪২ মেগাওয়াট থেকে ১৫৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ৮১টি নতুন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে, নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং ৪১টি নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়া ১ কোটিরও বেশি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে আরো ২ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

দেশের বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কর্মসংস্থান। রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

Regd, Dha, 143-Monthly Nabarun, Vol-42, No- 8, February 2018, Tk-20.00

তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ

‘পলাশ ফুটেছে, শিমুল ফুটেছে এসেছে দারুণ মাস’ গানের মতো করেই বাংলা ঋতুতে এসেছে ফাগুন মাস। শেষ ঋতু বসন্ত আর বাংলা সনের এগারোতম মাস ফাল্গুন। ফুল ফোটার পুলকিত এই দিনে বন-বনান্তে কচি পাতায় আলোর নাচনের মতোই বাঙালির মনে লাগে দোলা। পাতার আড়ালে, আবডালে লুকিয়ে থাকা বসন্তের দূত কোকিলের মধুর কুহুকুহু ডাক, দখিনা হাওয়া, ঝরা পাতার শুকনো নূপুরের নিক্কন এই বসন্তেরই সঙ্গী।

বন্ধুরা, এসো জেনে নেই ভাষার মাসে ভাষা নিয়ে কিছু কথা। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ফেব্রুয়ারি হলো আমাদের ভাষার মাস। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রান্তিক ভাষা বাংলা। বিশ্বে এখন বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৯৩টি দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বা প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব লেঙ্গুইস্টিকস আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় দেখা যায়, পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার নয়শত নয়। এটা অবশ্য ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী। এ ভাষাগুলোর মধ্যে অনেক ভাষা লুকিয়ে রয়েছে, অনেক ভাষা বিলুপ্তপ্রায়, অনেক ভাষা বদলাতে বদলাতে অন্য রকম হয়ে গেছে। আবার অনেক ভাষায় কথা বলে গুটিকয়েক মানুষ।

তবে বন্ধুরা, যাই বলো না কেন বাংলা ভাষা আমাদের অহংকার। এই ভাষার জন্য আমরা গর্ববোধ করি।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

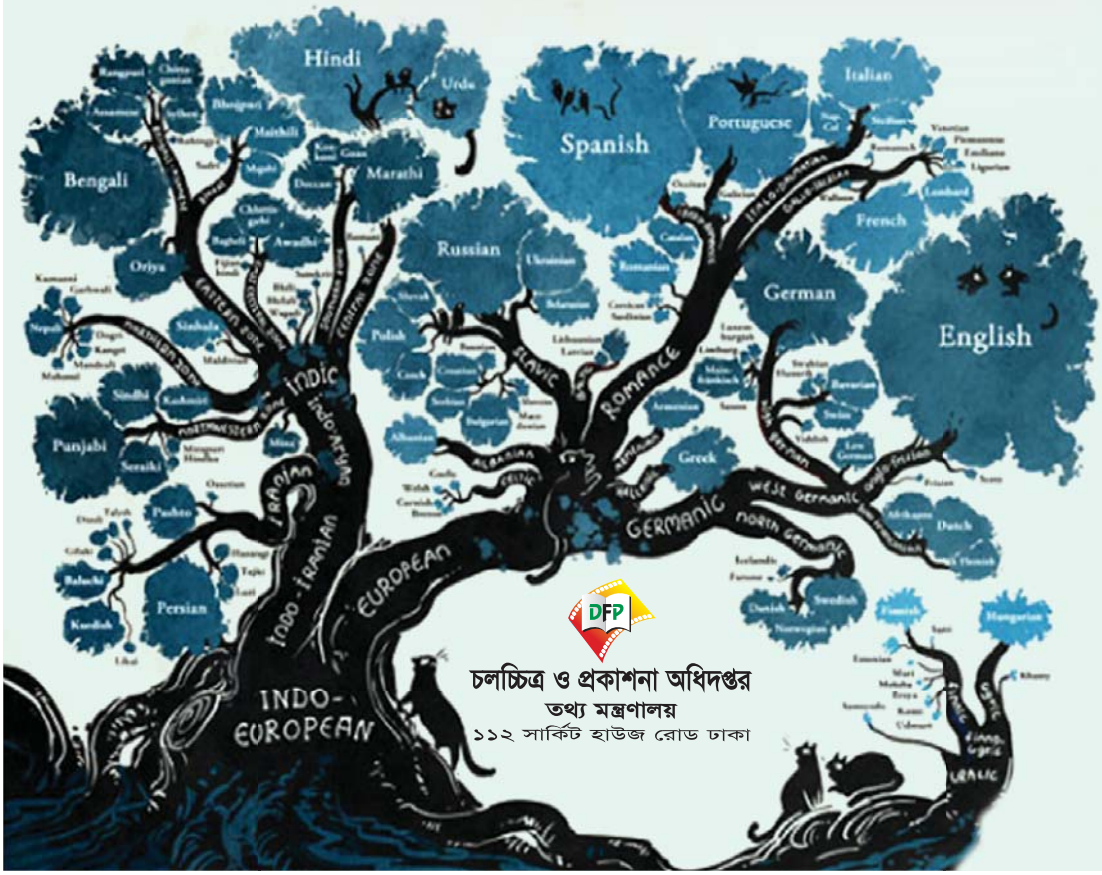

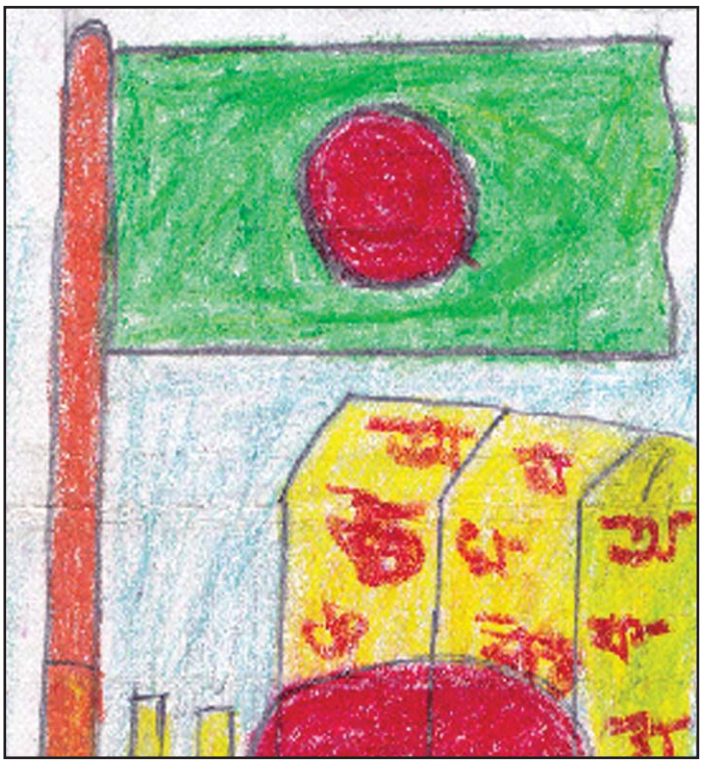

ওকি, চতুর্থ শ্রেণি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

মায়ের মুখের ভাষার সম্মান রাখতে, মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে এ দেশের মানুষকে লড়াই করতে হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ হয়েছিলেন রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতরা। সেই থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহিদ দিবস। বহু বছর পর বাংলাদেশের দুই কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান জাতিসংঘে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টা যোগ হয় এর সাথে। ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে আসে কাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটি। সেই থেকে বিশ্বের সব দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস হিসেবে।

এই মহান দিনে শ্রদ্ধা জানাই '৫২-এর ভাষা শহিদদের, কানাডা প্রবাসী রফিক-সালামসহ বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষার সম্মান রাখতে সোচ্চার প্রতিটি মানুষকে।

এ বছর প্রথমবারের মতো ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখকে ঘোষণা করা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে। আর প্রতি বছরের মতো বইমেলা তো থাকছেই।

ভালো বই পড়ব। ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠব। এই শুভ কামনা রইল সবার জন্য।

বইয়ের বাড়ি মজার বাড়ি

মিনহাজ উদ্দিন আহাম্মদ

গ্রন্থাগার মানে গ্রন্থের আগার। গ্রন্থ মানে বই। আগার মানে বাড়ি। তাহলে, গ্রন্থাগার যে বইয়ের বাড়ি! সে বাড়িরও যে কত রকম আছে, জানলে চোখ কপালে উঠে যাবে তোমার। ঝটপট পড়

পৃষ্ঠা ২১

হেলেন কেলার ও দৃষ্টিহীনের 'ভাষা' ব্রেইল, পড় পৃষ্ঠা ৩৩

কামাল হোসাইন

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সূচি

নিবন্ধ

৪ ভাষার লড়াই-এর ঘটনাপঞ্জি / শাহানা আফরোজ
১৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: কলম্বোতে সৃজনশীল আয়োজন মালেকা পারভীন
১৮ জানা-অজানা / মেজবাউল হক
২১ বইয়ের বাড়ি মজার বাড়ি / মিনহাজ উদ্দীন আহাম্মদ
৪৭ আকাশে গৌরি দীপশিখা : সূর্য ও তার গ্রহরা সানাউল্লাহ আল-মুবীন
৬৩ বেদে কন্যা সুমীর সফল হওয়ার গল্প / মোহাম্মদ সাজেদ

গল্প

১০ পাখিদের একুশে / রফিকুর রশীদ
১২ ভাষার মিছিল / আমিনুল ইসলাম মামুন
১৪ একুশে ফেব্রুয়ারি / নাসিম সুলতানা
৩৯ লাটিম / মো. রহমত উল্লাহ্
৪০ রাজার উপদেষ্টা / বিএম বরকতউল্লাহ
৪৩ ঘাসফড়িং, বুনোহাঁস ও ব্যাঙের গল্প / আহমেদ কিবরিয়া
৫৯ স্কুলে প্রথম দিন / অর্ঘ্য দত্ত
৬১ ষাঁড় এবং গাধার গপ্‌প / সুহাইবা সেলিম
৬২ খম্পুই / নাজিয়া জাবীন

স্মৃতিকথা

৪৪ মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধ/ মুহাম্মদ তারিক জামিল

কবিতার হাট

৪ নিতু চৌধুরী
৫ রহীম শাহ
৭ শোভা ত্রিপুরা / গোলাম নবী পান্না
আবুল কালাম বেলাল / আবির হোসেন
৮ মনসুর জোয়ারদার / চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু
৯ গাজী সাদিকুল হক / পারভীন আক্তার লাভলী
১৪ দেলওয়ার বিন রশিদ
১৯ সানোয়ার শান্তি / আফনান আহমেদ রাশেদ / রীনা তালুকদার
২০ ফারুক নওয়াজ
২৯ লাবিবা তাবাসসুম রাইসা / শফিকুল ইসলাম শফিক
৩২ মুস্তফা হাবীব / অমিতাভ মীর / সাইফুল ইসলাম সাইফ
৩৫ মোহ্‌সেন আরা
৩৮ আহসানুল হক / শরীফ সাথী / তানজিল দেলওয়ার খান (রিজ)
মো. তাসিন হোসেন
৪২ সাফওয়ানা রেজা অদ্রি / মাহদি তানিম রেদওয়ান
৪৪ দন্ত্যন ইসলাম
৪৬ মিনহাজ ফয়সল

রহস্য গল্প

রহস্যময় বুড়ো ৫৩
অবনিল আহমেদ

মজার গল্প

গেস্ট রুম রহস্য ৫৪
স.ম. শামসুল আলম

বিতর্ক, বক্তৃতা ও উপস্থাপনার কথা-কৌশল

৫৭
নাজমুল হুদা

শিল্প নির্দেশনা
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ :
সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

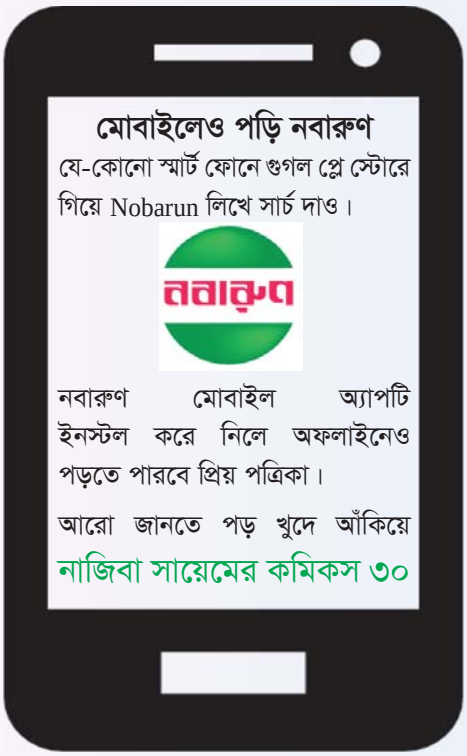

মোবাইলেও পড়ি নবারুণ

যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখে সার্চ দাও।

নবারুণ মোবাইল অ্যাপটি ইনস্টল করে নিলে অফলাইনেও পড়তে পারবে প্রিয় পত্রিকা।

আরো জানতে পড় খুদে আঁকিয়ে

নাজিবা সায়েমের কমিকস ৩০

মতামত...

Sayed Chowdhury: এগিয়ে যাক নবারুণ, সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ুক শিশুবেলা থেকেই।

রেজা নওফল হায়দার: একটি মাইলফলক পার করল নবারুণ। শুভেচ্ছা তোমায় নবারুণ।

Apu Chowdhury: খুব সুন্দর আয়োজন!! যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে!

সূচি

আঁকা ছবি

১ ওকি

২ দ্বিতীয় কভার: মীর্জা মাহের আসেফ / তাসিন মুমস্বাদ

প্রতিবেদন

৩৭ দশ বছরে স্পর্শ / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৬৫ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ / সুলতানা বেগম

৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সাদিয়া ইফফাত আঁখি

অনলাইনে নবারুণ পড়

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে পুরো পত্রিকাটি ডাউনলোড করে পড়।

নবারুণ-এর ফেসবুক পাতা (facebook.com/nobarunpotrikabd) থেকেও পড়তে পারবে।

ভাষার লড়াই-এর ঘটনাপঞ্জি

শাহানা আফরোজ

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরের আগে এ দিবস ছিল শুধু শহিদ দিবস বা ভাষা দিবস। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বে। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে সালাম, বরকত, রফিকসহ অনেকেই শহিদ হন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষা। এসো এবার জেনে নেই ভাষার জন্য আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি।

১৯১৮

ব্রিটিশ পরাধীনতার যুগে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষাকে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

১৯২১

সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে লিখিত প্রস্তাব দেন।

১৯৩৭

দৈনিক আজাদ 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

১৯৪৭

তমুদ্দুন মজলিস নামক পত্রিকার সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবি করা হয়।

১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগের জন্ম। প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনবার বিলটি উত্থাপন করেন এবং বাতিল হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমাবেশ শেষে বের হওয়া মিছিল থেকে শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, শওকত আলী, অলি আহাদ সহ বেশ কয়েকজন ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার হয়।

ভাষা শহিদ

নিতু চৌধুরী

কোনো দেশেতে আছে এমন
ভাষার জন্য মরেছে তরুণ
মায়ের ভাষা বাংলা চায়
এই দাবিতে শহিদ হয়!

যায়নি তারা মুছে আজও
সবার মনে আছে জেনো
হয়ত তারা ঘুমিয়ে আছে
তাই বলে কি নেই কাছে ?

মা বলে ডাকি যখন
মনে পড়ে ঠিক তখন
ভাষার জন্য করেছে তারা
নিজের জীবন ত্যাগ..

৫ম শ্রেণি, চকপাড়া আইডিয়াল পাবলিক স্কুল, শ্রীপুর, গাজীপুর

স্বপ্ন-দেখা ছেলে

রহীম শাহ

পলাশ-শিমুল কী রং ছিল
খোঁজ ছিল না কারও
হয়ত লালই ছিল, তবে
এতটা নয় গাঢ়।

সেই পলাশের সেই শিমুলের
খোঁজটা নিতে গেলে,
হঠাৎ করে চমকে ওঠে
স্বপ্ন-দেখা ছেলে।

কারণটা কী? কয়েক হাজার
হায়না দিল হানা;
বলল তারা, 'ফুলের রঙে
স্বপ্ন দেখা মানা।'

স্বপ্ন দেখা ছেলেরা কি
সেই সে মানা মানে?
প্রয়োজনে আবার তারা
মিছিল করতে জানে।

হায়নাগুলো মিছিল দেখে
ছুড়তে থাকে গুলি,
স্বপ্ন-দেখা ছেলেরা হয়
একেকটা রংতুলি।

সেই তুলিতে আঁকল তারা
একটি মহাকাল,
সেদিন থেকে পলাশ-শিমুল
অনেক বেশি লাল।

রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনতার প্রতিবাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিকে নাকচ করেন। সমাবর্তন স্থলে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে নো নো- বলে প্রতিবাদ করেন।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে দাবি দাওয়ার পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার একটি দাবিনামা পাঠ করা হলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কয়েকটি দাবি মেনে নেন। রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত দাবিটি এড়িয়ে যাওয়ায় সমাবেশ স্থলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৯

তৎকালীন গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দিনের উদ্যোগে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে আরবি হরফে প্রচলন করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব দেয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ সকল ভাষাতত্ত্ববিদ আরবি হরফে বাংলা লেখার এই উদ্ভট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক (টাঙ্গাইল) এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫০

পার্লামেন্টে আরবি হরফে বাংলা লেখার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৫১

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পুনরায় গণপরিষদে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেন কিন্তু পূর্ব বাংলার সংসদ সদস্যদের একাংশের তীব্র বিরোধিতার মুখে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার।

১৯৫২

পুনরায় উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অ্যাসেম্বলিতে চূড়ান্ত নির্দেশনা প্রদান করে পাকিস্তান সরকার।

জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানের সমাবেশে ঘোষণা করেন কেবল মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে সমাবেশ স্থলে এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

ভাসানীর সভপতিত্বে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে।

পাকিস্তান সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে। সকল সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠের পাশে ঢাকা মেডিকেল কলেজের (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত) গেটের পাশে কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, গাজীউল হক প্রমুখের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ শুরু হয়।

এ অবস্থায় উপস্থিত সাধারণ ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের অন্তর্গত) দিকে যাবার উদ্যোগ নেয়। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি শুরু করে। গুলিতে ঘটনাস্থলেই আবুল বরকত (ঢাবি-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাষ্টার্সের ছাত্র), রফিকউদ্দিন আহমদ, এবং আব্দুল জব্বার নামের তিন তরুণ মৃত্যুবরণ করেন। পরে হাসপাতালে আব্দুস সালাম (যিনি সচিবালয়ে কর্মরত ছিলেন) মৃত্যুবরণ করেন। অহিউল্লাহ নামে ৯ বছরের একটি শিশুও পুলিশের গুলিতে মারা যায়। পুলিশের সাথে ছাত্রদের তিন ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলতে থাকে। পুলিশ গুলি করেও ছাত্রদের স্থানচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়।

হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জড়ো হয়ে জানাজার নামাজ আদায় করে এবং একটি শোক মিছিল বের করে। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ পুনরায় গুলি চালালে শফিউর রহমানসহ চারজন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। উত্তেজিত জনতা দি মর্নিং নিউজ- এর অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের পাশাপাশি আর্মি নামিয়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার।

উপায়ন্তর না দেখে নুরুল আমিন তড়িঘড়ি করে আইন পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আনেন এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়।

ছাত্রছাত্রীরা ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে বরকত শহিদ হওয়ার স্থানে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে একটি অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে। ভোর ৬টার সময় শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সকাল ১০টার দিকে শহিদ শফিউর রহমানের পিতা স্মৃতিস্তম্ভটির ফলক উন্মোচন করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলেই সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে স্থাপিত শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ গুঁড়িয়ে দেয়।

১৯৫৩

১৯৫২-এর ছাত্র-জনতার আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে হাজার হাজার জনতা অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

১৯৫৪

মাওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৫৬

পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে তা সংবিধানের অন্তর্গত করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার কর্তৃক শহিদমিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৩ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম কর্তৃক বর্তমান শহিদমিনারের আনুষ্ঠানিক উব্‌বোধন করেন।

পাকিস্তান জাতীয় সংসদ বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান পাস করে।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে তমুদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে মায়ের ভাষায় কথা বলার যে আন্দোলনের শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এর সাফল্য অর্জিত হয়।

তথ্যসূত্র : বাংলা পিডিয়া ও উইকিপিডিয়া

একুশ এলে

শোভা ত্রিপুরা

একুশ এলে কৃষ্ণচূড়ার ফুলে
বনে বনে আগুন লাগে,
একুশ এলে বর্ণমালার দীঘল ছায়ায়
হৃদয় জাগে।
একুশ এলে শহিদ বেদী
ফুলে ফুলে যায় যে ভরে,
একুশ এলে মায়ের চোখে
অশ্রু ঝরে।
একুশ এলে বোনের নকশি কাঁথায়
চমকে উঠে শহিদ ভাইয়ের মুখ
বুকের ভিতর অনল দহন
একুশ মানে ত্যাগের আপন সুখ।

দেশের ছবি

গোলাম নবী পান্না

দেশকে নিয়ে ভালোবাসায় মায়ার ছবি ভাসে,
স্নিগ্ধ-শীতল পরশ তারই ফিরে ফিরে আসে।

তার সে ছায়া আগলে রাখে সারা জীবনভর
আমরা তাকে ভুলে গেলেও সে করে না পর।

দেশকে নিয়ে ভাবার আছে অনেক কিছু তাই
এই দেশেরই কাছে সবার ঋণের সীমা নাই।

দেশের হাওয়ায় বেড়ে ওঠায় কম কী সে হয় চাওয়া?
দেশের কাছে যেন সবার সকল চাওয়া-পাওয়া।

দেশকে ছেড়ে প্রবাস জীবন–পাড়ি জমায় যারা
দেশের প্রতি প্রবল মায়া বুঝতে পারে তারা।

যতই দূরে থাকেন তবু দেশের মায়া টানে–
সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন দেশের ছায়া-গানে।

তাই বলি এই দেশকে সবাই প্রিয় বলে জানুন
ভালোবেসে দেশের ছবি স্মৃতির রেখায় টানুন।

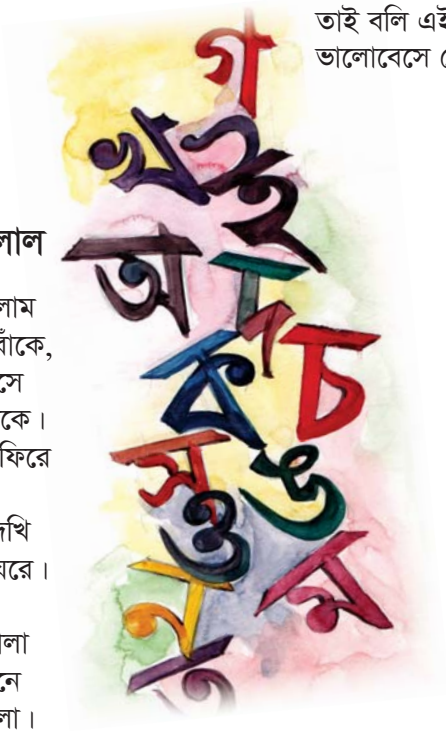

বই পড়া

আবুল কালাম বেলাল

ধরব বলে, হাত বাড়ালাম
বন-বাগানে ঝোপের বাঁকে,
কম্পুটারের বাতাস এসে
উড়িয়ে নিলো ফড়িংটাকে।
কী আর করা! এলাম ফিরে
ধবধবে সেই মনিটরে
ওমা সে-কী! ফড়িং দেখি
নাচছে রাঙা আলোর ঘরে।
ইচ্ছেমতো ফড়িং ধরি
ইচ্ছেমতো আঁকছি ম্যালা
ফড়িং এখন মন-বাগানে
স্বপন নিয়ে করছে খেলা।
আমার যখন ফড়িং ধরা
কিংবা আঁকার সময় আসে
মনের রাঙা স্বপ্নগুলো
রং ছড়িয়ে দারুণ হাসে!

বাংলা ভাষা

আবির হোসেন

মায়ের মুখের শেখা বুলি
এত সহজে কী যাবো ভুলি?
প্রতিবাদ তাই উঠলো সুরে
না না না ধ্বনি তুলে!
ভাইয়ের রক্তে হলো স্বাধীন
বাংলা ভাষা এখন আমাদের অধীন।

অষ্টম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

কৃষ্ণচূড়া

মনসুর জোয়ারদার

কৃষ্ণচূড়া দেখেছো
শহিদ স্মৃতির ফুল
বাংলাদেশে চিনতে ওদের
হয় না কোনো ভুল।
ফেব্রুয়ারির একুশে এলে
শহিদ দিবস আসে
লাল টুকটুক কৃষ্ণচূড়া
নয়ন জলে ভাসে।
জীবন দিয়ে মায়ের ভাষার
রাখল যারা মান
তাঁদের গাথায় কৃষ্ণচূড়ার
গর্বে নাচে প্রাণ।

ভাষার জন্য

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

বাংলা ভাষার জন্য সেদিন
উঠল তুমুল ঝড়
ঝড়ের জোরে পশ্চিমাদের
ঘর হলো নড়বড়।
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা
কেউ কখনো মানে!
খবর খানা সারাদেশে
ছড়ায় কানে কানে।
ক্ষেপল মানুষ রাজপথে তাই
রক্ত তাদের ফোটে,
দলে দলে প্রাণের টানে
মিছিলে সব ছোটে।
পিচঢালা পথ রক্তে ভাসে
দামাল ছেলের আত্মত্যাগে
তাও থামেনি তারা,
বাংলা ভাষা আনল সেদিন
রক্ত পলাশ যারা।
সেদিন থেকে শহিদমিনার
সাজাই ফুলে ফুলে,
বীর সেনানীর ত্যাগের কথা
যাইনি আজও ভুলে।

প্রথম পাঠশালা

গাজী সাদিকুল হক

মায়ের কাছে সবার আগে
বর্ণমালা শিখি
চকটা দিয়ে শ্লেটের মাঝে
অ আ ক খ লিখি।
আর শিখি যে আম্মু আমার
এবং আব্বু ডাকা,
ফুপু, খালা, খালু, মামা
ভাইয়া, দাদু, কাকা।
খোকন খোকন, চাঁদ মামা আয়
মজার মজার ছড়া,
আ দিয়ে আম, ক তে কাঁঠাল
অনেক অনেক পড়া।
প তে পাখি, ফ দিয়ে ফুল
ফুল দিয়ে হয় মালা,
মা-ই আমার লেখাপড়ার
প্রথম যে পাঠশালা।

বিশ্বজয়ী অমর একুশ

পারভীন আক্তার লাভলী

একুশ আমার গর্ব
একুশ আমার অহংকার
একুশ আমায় পথ দেখায়
অন্যায় আগ্রাসন রুখবার।
একুশ আমার মাতৃভাষার
মর্যাদা রক্ষার অবিনাশী চেতনা।
একুশ আজ বিশ্ববাসীর
মাতৃভাষায় বেঁচে থাকার প্রেরণা।
স্বাধীন পতাকা স্বাধীন ঠিকানা
বাঙালির চির জনমের আশা,
তাই একুশ এনেছিল কণ্ঠে সেদিন
তীব্র প্রতিবাদের ভাষা।
একুশের রক্তস্রোত বেয়ে
এসেছে বাংলার স্বাধীনতা,
অমর একুশ সুদৃঢ় করেছে
স্বাধীন বাঙালি সত্তা।

রফিকুর রশীদ-এর গল্প

পাখিদের একুশে

পাখিটার যেন ব্যস্ততার অন্ত নেই।

এ গাছে ও গাছে, এ ডালে ও ডালে ওড়াওড়ি কিংবা ঘোরাঘুরির যেন শেষ নেই। শহিদমিনারের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে সে নেচে বেড়ায়। যেখানে যাকে পায়, অমনি তাকে শুধায়- গান গেয়েছিস তো-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ?

পাখিদের রাজ্যে গান তো সবাই গায়। গান গাইতে গাইতেই তারা রাতের আঁধার তাড়ায়, সূয্যিমামার ঘুম ভাঙায়, ফুলেদের মুখে হাসি ফোটায়। গানই তাদের সব কাজের মূলমন্ত্র। আর তাছাড়া আজকের এই দিনে কোনো পাখিই কি পারে গান না গেয়ে থাকতে! আজকের এই গানে হাসি এবং কান্না দুই-ই থাকে মিলেমিশে। মায়ের চোখের জল অথবা পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনাধারার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় এই গানের ভেতরে। মাটির ঘ্রাণ এবং আকাশের রোদ্দুর দুটোই একসঙ্গে থাকে এই গানে। হাজার কণ্ঠে প্রভাতফেরির এই গান গুঞ্জরিত হয়ে উঠলে তখন এ দেশের পাখিরা কী করে। ঘুমভাঙা চোখে তাকায় এদিক-ওদিক। কুয়াশার চাদর সরিয়ে অবাক চোখে মানুষ দেখে, মানুষ আর মানুষ, যেন বা মানুষের ঢল। সবার কণ্ঠে একই গান, একই সুর। পাখিরাও তখন ভাই হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে গেয়ে ওঠে ওই গান।

পাখিটার গায়ের রং সাদা-কালোর মিশেল দেওয়া। কালো বলতে একেবারে কুচকুচে কালো, মেঘ কালো আঁধার কালো। সাদাটুকু স্রেফ ধবধবে সাদা, চৈতি চাঁদের জোছনার মতো, হাসনাহেনা ফুলের মতো। রংয়ের বৈপরীত্যে মানিয়েছে বেশ। যেন বা গায়ে তার ডোরাকাটা জামা। নাম তার দোয়েল, বাংলাদেশের মানুষ বলে জাতীয় পাখি। কতশত পাখির মধ্যে সে আলাদা। শহর-নগরে কাকের সংখ্যাই বোধ হয় বেশি। বাপরে বাপ। পাখিদের রাজ্যে এমন নিকষ কালো রংয়ের আর কোনো পাখি আছে কিনা কে জানে। সারাদিন কেবল কা কা চিৎকার, ভারি ঝগড়ুটে গলার স্বর। অনেক সময় পাখিদেরও বিরক্ত বোধ হয়। কিন্তু আজকের এই দিনে একটুও বিরক্ত হয় না দোয়েল। বরং মনে মনে বলে-কী করবে ওরা। ওটাই যে ওদের মাতৃভাষা। মা বলো আর মাতৃভাষা বলো তার আবার সুন্দর-অসুন্দর কী। মা মানেই সুন্দর। মাতৃভাষা সব সুন্দর।

দোয়েল পাখি লেজ নাচিয়ে গেয়ে ওঠে-সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি। হঠাৎ সে ডান দিকের ডানার তলে ঠোঁট গুঁজতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, চোখ সরু করে তাকায়। খুব কাছেই অন্য একটি ডালে বসে আছে এক ঝাঁক অচেনা পাখি। বিদেশি সাহেব সুবোর মতো চেহারা। হ্যাঁ, অচেনাই তো মনে হচ্ছে। একেবারে সামনের ওটা কি মেমসাহেব নাকি। এক লাফে দোয়েল একটু এগিয়ে যায় ওদের কাছে। খুব কাছের একটা ডালে বসে জিজ্ঞেস করে-

তোমরা কারা?

মেমসাহেবের মতো দেখতে পাখিটা বলে, আমরা তো ভাই বিদেশি। শীত এলেই আমরা আসি তোমাদের দেশে।

ও, তোমরা তাহলে আমাদের অতিথি।

হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি। নিশ্চয়ই তোমাদের অসম্মান হবে না।

দলছুট এক অতিথি পাখি শহিদমিনারের মাথার উপরে উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে এসে দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মেমসাহেব পাখিটা তাকে শুধায়- কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ?

দলছুট পাখি একটু দম নিয়ে বলে। ওই তো ওখানে। শহিদমিনার দেখছিলাম।

মেমসাহেব জিজ্ঞেস করে- শহিদমিনার কাকে বলে জানিস? ওর মধ্যেই মা আছে, সন্তান আছে দু'পাশে-জানিস?

তা তো জানি না।

তাহলে আর উড়ে উড়ে কী দেখলি তুই?

মানুষ দেখলাম। হাজার হাজার মানুষের মিছিল। শত শত ফুলের মালা উপর থেকে উড়ে উড়ে দেখার মজাই আলাদা।

মেমসাহেব মুখ ভেংচিয়ে বলে, তোর তো সব কিছুতেই মজা। আজ এখানে কেন এত মিছিল, কেন এত ফুলের মালা সেই কথাটা বল দেখি?

না, দলছুট পাখির মুখে কথা নেই। অকারণেই দু'বার পাখা ঝাপটায় সে। দোয়েল এবার এগিয়ে এসে বলে, আহা, ওকে এত ধমকাচ্ছো কেন ভাই? সে সব কথা তো এই আমাদের মধ্যেই অনেকে মনে রাখে না।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কী! সেই ১৯৫২ সালের কথা ক'জনই বা ঠিকমতো জানে। মায়ের মুখের ভাষার জন্য তেমন লড়াই পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি কোনো কালে। কিন্তু এই দেশে হয়েছে, এই এখানে।

ভাষার জন্য লড়াই? বিদেশি অতিথি পাখিদের মধ্যে একজন অতি উৎসাহে মুখ বাড়িয়ে দেয়। আপন মনেই সে বলে-ভাষা তো এমনিতেই পাওয়া যায় মায়ের মুখ থেকে। তার জন্য লড়াই কিসের?

দোয়েল পাখি হেসে ওঠে ফিক করে। তারপর পাখা নেড়ে বলে, ঠিক বলেছ ভাই, মাতৃভাষা মায়ের কাছ থেকে এমনিই পাওয়া যায়। এ দেশের মানুষকে তবু মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য লড়তে হয়েছে, পুলিশের গুলিতে মরতে হয়েছে। মরার কথা শুনে দেশি-বিদেশি অনেক পাখিই চমকে ওঠে।

বলো কী! ভাষার জন্য মৃত্যু?

হ্যাঁ, তাই। বাংলা ভাষার দাবি জানাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে রফিক, শফিক, সালাম, বরকতসহ আরো অনেকে। এ দেশে তাদের বলে ভাষা শহিদ। সেই শহিদের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতেই বাঙালি গড়েছে শহিদমিনার।

মেমসাহেব পাখি বলে, বাব্বা! তুমি এত কিছু জানো।

দোয়েল এতক্ষণে লজ্জায় মুখ নিচু করে। অন্যান্য দেশি পাখিরা জানায়, বাংলাদেশের জাতীয় পাখি যে! বাঙালি জাতির অনেক খবরই সে রাখে। ও, তাই বুঝি। সেই থেকে এই শহিদমিনার।

না না, এটা বাহান্ন সালের সেই শহিদমিনার নয়। দোয়েল পাখি খুব পণ্ডিতের মতো জানায় তারপর কত ভাঙা-গড়া হয়ে গেল। কত যে রক্তপাত আর কত যে অশ্রুজলের মূল্যে পাওয়া এই বাংলাদেশ। সবকিছুর মূলে ওই শহিদমিনার। বর্ণনার এই ভঙ্গি দেখে মেমসাহেব পাখি খুব খুশি। সে আনন্দের সঙ্গে বলে, তোমার কাছে ইতিহাসের গল্প শুনে খুব মজা লাগছে তো! আরো অনেক শোনাও না ভাই। আচ্ছা, সে একদিন শোনাবো না হয়। আজ শুধু শুনে রাখো বাঙালির ভাষা বাংলা ভাষা বড়োই মধুর ভাষা। বাংলাদেশ খুবই মনোরম এক দেশ। এই দেশ ছিল পরাধীন। তখনকার শাসকেরা বাঙালির মুখ থেকে বাংলা ভাষা কেড়ে নেওয়ার জন্য নানানরকম ফন্দি আঁটে। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুতেই। বাহান্ন সালের এই একুশেতে বাংলা মায়ের সোনার ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে প্রতিষ্ঠা করে মাতৃভাষার মর্যাদা।

গল্পের মাঝখানে হঠাৎ ব্রেক কষতে হয় মেমসাহেব পাখির জন্য। সে পাখা ঝাপটিয়ে সহসা বলে ওঠে- ওটা কী হচ্ছে দোয়েল ভাইয়া? শহিদমিনারের সামনে হাত উঁচিয়ে ওরা সবাই কী বলছে?

দোয়েল পাখি সংক্ষেপে জানিয়ে দেয়, দেশ গড়ার শপথ নিচ্ছে। তারপর সবাইকে আহবান জানায়, চলো আমরাও ওদের মাথার উপরে ডানা মেলে ছায়া দেই; এই একুশে আমরাও শপথ নেই।

তারপর পাখিরা উড়ে যায়। আপন ভাষার কুজনে ভরিয়ে দেয় আকাশ বাতাস।

ভাষার মিছিল

আমিনুল ইসলাম মামুন

ক্লাসে বসে আছে তাইফ। বেঞ্চের ওপর কনুই রেখে গালের নিচে হাত তার। পাশেই রাখা বইগুলো। বইয়ের ওপর রয়েছে লেখার কলমটিও। অন্যান্য দিন সে ক্লাসের অল্প আগে আসে। তবে আজ এসেছে বেশ কিছুটা সময় আগেই। একজন দুজন করে ক্লাসে ঢুকছে ছাত্রছাত্রীরা।

রুবেল তাইফের বন্ধু। সেও ঢুকল ক্লাসে। ওদের মধ্যে সম্পর্কটা অন্যদের চাইতে একটু আলাদা। দুজনই প্রতিদিন প্রথম বেঞ্চে বসে। রুবেল আজ তাইফকে সামনের বেঞ্চে না দেখে কিছুটা অবাক হলো। তার উপর তাইফকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। উদাস ভঙ্গীতে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তাইফের পাশে গিয়ে পিঠে হাত রাখল রুবেল। কিছু না বলে জিজ্ঞাসু ভঙ্গীতে তাকালো তাইফের দিকে। তাইফ রুবেলের দিকে তাকালো। তারপর ভারি কণ্ঠে বলল, পরীক্ষাটা মনে হয় আর দিতে পারব না রে! শুধু আমিই না; আমাদের কেউই পারবে না।

: কেন, কী হয়েছে?

: বাবা রাতে ঢাকা থেকে এসেছেন। তিনি বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। পাকিস্তানিদের এ ঘোষণা মানা যায় না। আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। এই দাবিতে মিছিল করতে গেলে পুলিশ সেখানে গুলি করে। কয়েক জন মারাও গেছে।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া, না হওয়া নিয়ে আগে থেকেই কথা শুনছি। এখন তো পরিস্থিতি তাহলে ভয়ংকর!

কথা শেষ হতে না হতেই ঘণ্টা পড়ল। স্যারও যেন ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনিও শ্রেণিকক্ষে এসে হাজির। ঢাকায় মিছিলে পুলিশের গুলির বিষয়ে তিনিও জানেন।

চোখে মোটা ফ্রেমের ভারি চশমা পরা আবিদ স্যার। অন্য দিন তিনি বেত হাতে কক্ষে প্রবেশ করলেও আজ তার হাতে বেত নেই। শুধু হাজিরা খাতা আর ডাস্টার। তিনি কক্ষে এসে চেয়ারে বসলেন কিছুক্ষণ। এরপর ক্লাস শেষ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সারাদিন তাইফ আর রুবেল এ নিয়েই আলোচনা করল। তাদের কথা থেকে ক্লাসের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে অবগত হলো। স্কুল ছুটির পর তারা দুজন মাঠের এক কোণায় গিয়ে বসল। কী যেন শলা পরামর্শ করল কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন যথারীতি ক্লাসে ঢুকলেন আবিদ স্যার। রোল কল করলেন তিনি। কয়েক জন অনুপস্থিত। কিন্তু তাইফ আর রুবেলের বিষয়টি তার নজরে এল। ছাত্রছাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তাইফ আর রুবেলের বিষয়ে। কেউ কিছু বলছে না। একটি মেয়ে দাঁড়ালো। নাম জেবা। সে বলল, স্যার কালকে ওদেরকে ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। মনে হলো এ বিষয়ে ওরা কিছু একটা করতে যাচ্ছে।

আবিদ মাস্টার চোখ কপালে তুললেন। বললেন, বলো কী! তা হলে তো সর্বনাশ! সাব্বির আর নাদেরকে বললেন, তোমরা দুজন এখনই যাও। ওদেরকে যেখানেই পাও আমার কাছে নিয়ে এসো। তা না হলে বিপদ ঘটতে পারে।

সাব্বির আর নাদের বেরিয়ে গেল।

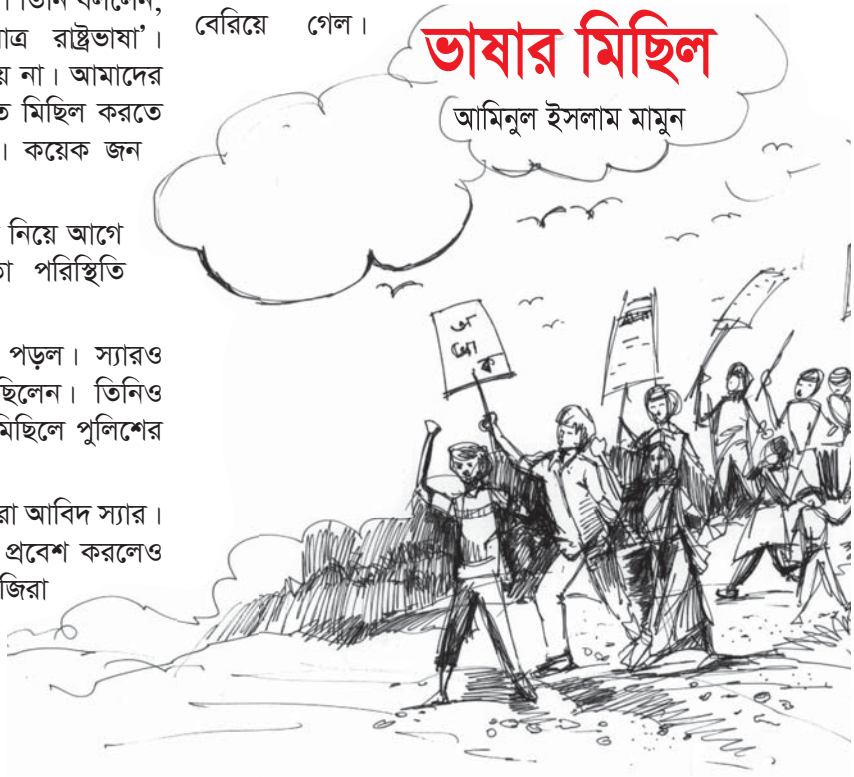

তাইফদের বাড়িতেই দুজনকে পাওয়া গেল। স্যারের কথা বলার পর ওরা রওনা হলো স্কুলের দিকে।

ক্লাস শেষ করে আবিদ স্যার টিচার রুমে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এসে পড়ল ওরা। তাইফ, রুবেল, সাব্বির আর নাদের দাঁড়িয়ে আছে। আবিদ স্যার চশমাটি খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর মাথা তুলে তাকালেন ওদের দিকে। তাইফকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর রুবেল আজ স্কুলে আসনি কেন?

: এসে কী লাভ হবে স্যার? বাংলায় যদি কথাই বলতে না পারি, পরীক্ষাই দিতে না পারি তাহলে স্কুলে এসে লাভ কী।

রুবেল বলল, তাই আমরা ঠিক করেছি মিছিল করব। ঢাকার মতো। সামনে আমি থাকব। মরতে হলে আমি মরব। আমার মা বলেছেন, আমি যখন কথা বলতে শিখি তখন আমার মুখ দিয়ে বের হয় 'মা'। সেই মা বাংলাতে কথা বলেছেন, বাবা বলেছেন, দাদা বলেছেন, দাদি বলেছেন। বাংলাকে তো কোনোরকমেই বাদ দিতে পারব না স্যার।

তাইফ বলল, শুনলেন তো স্যার। ঢাকায় রক্ত ঝরছে আর আমরা এখানে বসে থাকব? থাকব না। গ্রামের মানুষকে নিয়ে কালকে মিছিল হবে। মায়ের ভাষা যারা কেড়ে নিতে চায়, তাদের তাড়ানোই এখন আসল কাজ।

সাব্বিরের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। অতি আবেগি কণ্ঠে সে বলল, আগে মিছিল তারপর ক্লাস।

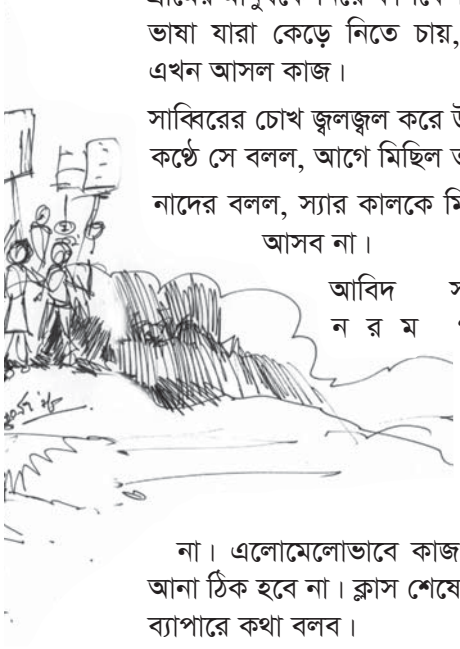

নাদের বলল, স্যার কালকে মিছিল। আমরা কেউ আসব না।

আবিদ স্যার দাঁড়ালেন। নরম গলায় বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি ঢাকার ঘটনা তোমরা সবাই জেনেছ। পরিস্থিতি ভালো না। এলোমেলোভাবে কাজ করে বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না। ক্লাস শেষে তোমাদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলব।

ওরা ক্লাসে চলে গেল।

আবিদ স্যার প্রধান শিক্ষকের সাথে বেশ কিছু সময় কথা বললেন। কিছুক্ষণ পর সকল শ্রেণিকক্ষে নোটিশ এল। ছাত্রছাত্রীদেরকে জানানো হলো স্কুল ছুটির পর মাঠে সমবেত হতে।

স্কুল ছুটি হলো। এক এক করে সবাই মাঠে জড়ো হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর প্রধান শিক্ষক এলেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কথা বললেন। ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলির বিষয়ে বিস্তারিত জানালেন। তারপর বললেন, আমাদের দুজন ছাত্র ঢাকার ঘটনার প্রতিবাদে কর্মসূচি হাতে নিতে চলেছে। বিচ্ছিন্নভাবে কর্মসূচি দিলে ফল আসার বদলে বিপদই আসে। তাই আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। মায়ের ভাষার সম্মান রক্ষায় কাজ করতে হবে। এই বার্তা প্রতিটি ঘরে পৌঁছাতে হবে। তাইফ ও রুবেল আগামীকাল যে মিছিলের কথা ভেবেছে সেটি সফল করতে হবে। সেজন্য সবার সকাল দশটায় এখানে জড়ো হওয়া চাই।

ছাত্রছাত্রীরা করতালির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

পরদিন সকাল দশটা। ছাত্র-শিক্ষকের পাশাপাশি বহু সচেতন লোক মিছিলে অংশগ্রহণ করে। সমবেত কণ্ঠে স্লোগান ওঠে–

'নদী চিনি মাকে চিনি
প্রাণের দামে ভাষা কিনি।'
'বাংলা কেন রক্তে ভাসে
বসন্তের এই ফাগুন মাসে।'
'বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা
বাবা-মায়ের সকল আশা।'
'আকাশ আমার ভাষা আমার
নেই তো সুযোগ আজকে থামার।'
'দৃপ্ত পায়ে চল রে সবে
বাংলা আমার ভাষা হবে।'

আকাশ-বাতাস কাঁপাচ্ছে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, সচেতন মানুষের এই অগ্নিমিছিল। গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলছে মিছিলটি। রাস্তার পাশে কৃষকেরা হাত উঁচিয়ে হাসিমুখে অভিনন্দন জানায় মিছিলকারীদের।

একুশে ফেব্রুয়ারি

নাসিম সুলতানা

প্রতি বছরের মতো এবার নীলক্ষেত বস্তির প্রাইমারি স্কুল 'ফুলকুঁড়ির' সকল ছেলে-মেয়েরা শহিদমিনারে ফুল দিতে যাবে। তারা স্কুলে রাশেদ স্যারের কাছে শুনেছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আর এই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার জন্য এ দিন যারা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার জন্য এই দিনটি পালন করা হয়। সারা পৃথিবীর সব দেশে এই দিন পালন করছে সব মানুষ।

এই ফুলকুঁড়ি স্কুলে রাবেয়াও পড়ে। ওর হাত দুটি নেই। জন্মের সময় এভাবেই জন্মগ্রহণ করেছে। তার মা গরিব। বাবাও নেই। মা অন্যের বাড়িতে ঝি এর কাজ করেন। কোনোরকমে তাদের দুজনের খাদ্য জোটে।

রাবেয়া যখন বড়ো হয়, তখন বস্তির ফুলকুঁড়ি স্কুলের গেটে বসে পড়া শুনত। তাদের পড়া শুনে তার ছড়া, নামতা মুখস্ত হয়ে যেত। একদিন রাশেদ স্যার তার পড়া শুনে অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে এই স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দেন। ক্লাসের সব ছেলে-মেয়েরা তাকে লেখাপড়ার বিষয়ে সহযোগিতা করে। সে সব মুখস্ত বলতে পারে।

কালকে খুব ভোর বেলা উঠে সবাই শহিদমিনারে যাবে। রাবেয়ার চোখে ঘুম নেই। সে ভাবছে- কেন সে যাবে না? তার হাত নেই। কিন্তু মুখে তো পারবে। ঠোঁট দিয়ে ফুলের ডাঁটিটা চেপে ধরে উপুড় হয়ে ফুলটি শহিদমিনারে রাখতে পারবে।

মাকে একথা বলতেই মা কেঁদে ফেললেন। বুঝলেন, তার মেয়েটি কত ভালো!

রাবেয়া আগেই একটি গোলাপ ফুল কিনে এনেছিল। পরদিন মায়ের সাথে স্কুলে গেল। স্যারকে রাবেয়া কিভাবে শহিদমিনারে ফুল দিবে- সেকথা বললেন মা।

একথা শুনে স্যারের চোখে অশ্রু বিন্দু জমে উঠল। আর তার সহপাঠিরা বলল, রাবেয়া তুই অবশ্যই যাবি। শহিদমিনারে তুই ফুল না দিলে আমরা কেউই ফুল দিব না।

এরপর ওরা সবাই মিলে রওনা দিল শহিদমিনারের উদ্দেশ্যে।

বাংলা আমার স্বপ্ন আশা

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাংলা আমার স্বর অ স্বর আ
মায়ের কাছে পড়া
নতুন বইয়ের রঙিন পাতায়
মজার মজার ছড়া।
বাংলা আমার মুখের ভাষা
গল্প কথা গান
বাংলা আমার সুখ ছন্দ
নদীর কলতান।
বাংলা আমার সুর সুমধুর
আম আঁটির বাঁশি
চিরল চিরল জারুল পাতায়
কাঁচা রোদে হাসি।
বাংলা আমার প্রিয় ভাষা
স্বপ্ন আশা সব
বাংলা আমার হৃদয় জুড়ে
খুশির কলরব।

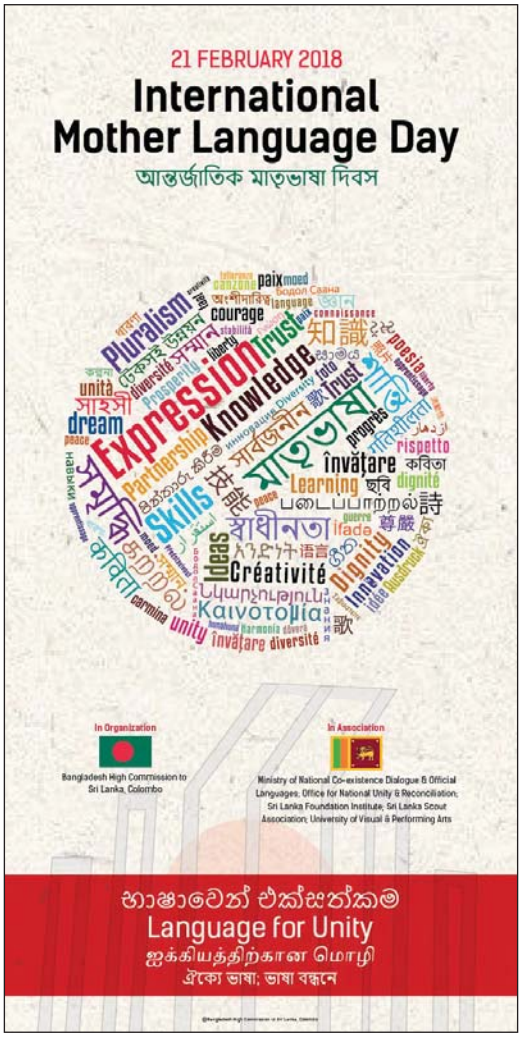

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কলম্বোতে সৃজনশীল আয়োজন

মালেকা পারভীন

প্রতি বছরের মতো এবারেও যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশেষ করে গত বছর (২০১৭) হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহর উদ্যোগে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত দিবসটি উদযাপনের ধারাবাহিকতায় এ বছরও হাই কমিশন শ্রীলঙ্কার একাধিক প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সকালে স্থানীয় বিহারা মহাদেবী পার্কে দিবসটি পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

২০১৭ সালের মতো এবারো অর্ধ-দিবসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানটি আয়োজনে বাংলাদেশ হাই কমিশন শ্রীলঙ্কা সরকার এবং দেশটির যে সমস্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগী হিসেবে সাথে নিয়েছে সেগুলো হলো Ministry of National Co-existence, Dialogue and Official Languages এবং এর আয়ত্তাধীন Department of Official Languages; Office for National Unity and Reconciliation (ONUR); SriLanka Foundation Institute (SLFI); University of Visual and Performing Arts (UVPA) Ges Sri Lanka Scout Association। এছাড়া, দেশটির সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও যৌথ উদ্যোগে দিবসটি যথাযথভাবে পালনে বাংলাদেশ হাই কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

গত বছরের অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী প্রচার সূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিন ভাষায় তৈরিকৃত পোস্টার এবং ফ্লাইয়ার। পোস্টার এবং ফ্লাইয়ারে বাংলা বর্ণমালার অক্ষরের পাশাপাশি সিনহালা, তামিল এবং ইংরেজি বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের ব্যবহার একটি অভিনব সৃজনশীল ধারণা হিসেবে স্থানীয় বোদ্ধামহলে প্রশংসিত হয়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ছিল, 'LANGUAGE FOR PEACE, HARMONY, STABILITY, PROSPERITY OF ALL.' এভাবে কোমল কূটনীতি (সফট ডিপ্লোম্যাসি) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই কমিশন মহান ভাষা শহীদ দিবসের তথা বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকতায়নের পাশাপাশি দিবসটি উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রত্যেকের মাতৃভাষার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

এছাড়া, গত বছরের মূল অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের পরপরই শিল্পাঙ্গন-কর্মসূচিতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ রংতুলি দিয়ে ক্যানভাসে মাতৃভাষায় নিজেদের মনের কথা তুলে ধরেন। এই সৃজনশীল অংশে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের স্পিকার কারু জয়াসুরিয়া ছাড়াও প্রধান অতিথি দাপ্তরিক

ভাষামন্ত্রী মানো গানেশন, উপস্থিত নানা দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দসহ সাধারণ দর্শকেরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন এবং এ ধরনের অভিনব সৃষ্টিশীল উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রশংসা করেন।

একই সাথে অনুষ্ঠানস্থলের আরেক পাশে UVPA এর সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাংলা, সিনহালা এবং তামিল ভাষায় বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গানের সুর যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরেন যা উপস্থিত দর্শকদের ভেতরে আলাদা ধরনের আমেজ তৈরি করে। বিশেষ করে যখন তারা বিভিন্ন সংগীতযন্ত্রের অর্কেস্ট্রায় মহান ভাষা শহিদ দিবসের অমর সংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র সুরটি বারবার বাজাতে থাকেন, তখন দেশ থেকে হাজার মাইলের দূরত্ব সত্ত্বেও উপস্থিত বাঙালিদের মনে তা ভীষণ আবেগের সঞ্চার করে।

পাশাপাশি অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে দেড় শতাধিক অতিথি অংশগ্রণ করেন এবং Sri Lanka Scout Association এর মাধ্যমে পরিচালিত এ ধরনের জনহিতকর উদ্যোগের জন্য পুনরায় বাংলাদেশ হাই কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইংরেজি ভাষায় পোস্টার

Where: Vihara Mahadevi Park (opposite of the Open Theatre), Colombo

Facebook: /international-Mother-Language-Day-Sri Lanka-160138724482852

PROGRAMME

0900	Welcome Remarks by H E Mr. M Riaz Hamidullah, Bangladesh High Commissioner to Sri Lanka
0905	Remarks by W.M.P.G. Wickramasinghe, Secretary, Ministry of National Co-existence, Dialogue and Official Languages
0910	Remarks by Mr. Velayuthan Sivagnanasothy, Secretary, Ministry of Integration and Reconciliation, Sri Lanka
0915	Remarks by Dr. Sarrath Kongahage, Chairman, Sri Lanka Foundation Institute
0920	Address by the Chief Guest: Hon. Madam Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Chairperson, Office for National Unity and Reconciliation, Sri Lanka

[Following the inauguration/discussion, the dignitaries and the members of the Diplomatic Community would proceed to the Canvasses under the canopy ...]

In parallel, from 0845 - 1130 hrs

MUSIC Connects:

Artistes (students) from the University of the Visual & Performing Arts, Colombo would render instrumental music of Bangla, Sinhala and Tamil patriotic songs live in the Park.

LETTERS Connect:

In the Park, young people, children, diplomatic community and ordinary citizens – representing different linguistic diversity – would be engaged in designing a poster in his/her mother language, in calligraphic handwriting, on the theme on "Mother – Mother Language – Motherland". Artists from the University would produce eight large-sized canvasses in the Park, embodying their expressions, emotions, reflections images on the same theme – "Mother – Mother Language – Motherland".

BLOOD Connects:

A voluntary blood donation Camp will be organized inside the Open Theatre. Everyone is invited to donate blood. The Camp is organized with support of the Sri Lanka Scout Association. The amount of blood collected would be donated directly to the National Blood Bank in aid of the under-privileged patients in need.

অনুষ্ঠান সুচি

প্রকৃতপক্ষে, গত বছরের সাফল্য এবং দেশি-বিদেশি সব মহলের প্রশংসা ও উৎসাহকে উপজীব্য করেই এ বছরও বাংলাদেশ হাই কমিশন আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস পালন উপলক্ষে একই ধরনের একটি ভিন্নধর্মী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ক্যানভাস-অঙ্কন/পোস্টার-লিখন, যন্ত্রসংগীতে দেশাত্মবোধক সংগীত এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিসহ তিনটি অংশে বিভক্ত এবারের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, 'ঐক্যে ভাষা, ভাষা বন্ধনে' অর্থাৎ LANGUAGE FOR UNITY.'

ইতিমধ্যে দিবসটি পালনে প্রচারসূচির অংশ

হিসেবে সংশ্লিষ্ট পোস্টার এবং ফ্লাইয়ার তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এ বছরের পোস্টারটির বিশেষত্ব হলো এতে বর্তমান পৃথিবীতে পরিচিত বেশিরভাগ ভাষা থেকে শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। মাতৃভাষা সংক্রান্ত বিষয়টির সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নিয়ে পোস্টারে ব্যবহৃত শব্দগুলোর নির্ভুল সন্নিবেশ নিশ্চিত করতে প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো কর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহের কাজটিও হাই কমিশনের উদ্যোগে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, ফ্লাইয়ারে ব্যবহৃত অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তুভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি বর্ণনার সাথে এর সিনহালা এবং তামিল অনুবাদ সংযোজনের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার Department of Official Languages এর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

সিনহালা ভাষায় পোস্টার

তামিল ভাষায় পোস্টার

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সকালে কলম্বোর বিহারা মহাদেবী পার্কে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং ONUR এর চেয়ারপার্সন ম্যাডাম চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গত বছরের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীলঙ্কার দাপ্তরিক ভাষামন্ত্রী মানো গানেশন এবং প্রধান বক্তা সিনহালা ভাষাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে বি দিসানায়াকা এবার বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি হিসেবে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করবেন। হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহর বিশেষ উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ সফরের আয়োজন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারো যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং অংশগ্রহণকারী সকলের সার্বিক সহযোগিতায় কলম্বোস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন সাফল্যের সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৮ পালন করতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই কমিশন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনসহ স্বাগতিক দেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের মাতৃভাষার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এ ধরনের সৃজনশীল উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বর্হিবিশ্বে একেবারে আলাদা মাত্রায় বাংলাদেশকে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

লেখক: কাউন্সেলর, বাংলাদেশ হাই কমিশন, কলম্বো

জানা-অজানা/ মেজবাউল হক

ভাষা আন্দোলন জাদুঘর

অমর একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে বছরে একবার বাংলা একাডেমি চত্বরে বাড়ে মানুষের পদচারণা। আর বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজের দোতলায় রয়েছে 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর'। ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন জাদুঘর উদ্‌বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষা আন্দোলন জাদুঘর পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই।

এই জাদুঘরে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে- বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিভিন্ন মিছিলের আলোকচিত্র, বাধা প্রদানে সারিবদ্ধ পুলিশবাহিনি, ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রনেতা শওকত আলীকে শেখ মুজিবুর রহমান রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ছবি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি, ভাষা শহিদদের আলোকচিত্র ও পরিচিতি, ভাষা শহিদদের বিভিন্ন স্মারকবস্তু, প্রথম শহিদমিনার ও প্রভাতফেরির আলোকচিত্র প্রভৃতি।

মরুভূমিতে ১৮ শতকের বাংলা পুঁথি

বন্ধুরা, আজ তোমাদের একটি বইয়ের কথা জানাবো। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলের প্রায় ৫০০ কিলোমিটার গভীর মরুভূমিতে বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় একটি প্রাচীন গ্রন্থ, যাকে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আলকোরান মনে করে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু একজন অস্ট্রেলিয়ান-বাংলাদেশি গবেষক সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন এটি আসলে বাংলা ভাষায় লেখা শত বছরেরও আগের একটি পুঁথি। গবেষক ড. সামিয়া খাতুন এই গবেষণার সূত্র ধরে অস্ট্রেলিয়ায় তৎকালীন বাংলা এবং ভারতবর্ষ থেকে মানুষের অভিবাসনের চমকপ্রদ এক ইতিহাসের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণায় দেখা যায়, বহু জাহাজি সেসময় ওই এলাকায় গিয়েছিলেন। এরা সে সময় অস্ট্রেলিয়ার গভীরে দুর্গম মরু অঞ্চলে কাজ করতে গিয়েছিলেন বহু বাঙালি। প্রথমে লেখাটি ছাপা হয়েছিল ১৮৬১ সালে, পরে এটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, কয়েক বার পুর্নমুদ্রিত হয় ১৮৯৫ সালে।

জেনে নেই ISBN কি?

বন্ধুরা, বইয়ের কভার পেজের পিছনে একটি ISBN কোড থাকে। দেখেছ কি? তাহলে এসো জেনে নেই এর কথা। দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের লেখা বইয়ের সংখ্যা কত তার হিসাব রাখা সহজ নয়। তবুও দুনিয়ার যত বই তৈরি হবে তার একটা হিসাব রাখার জন্যে একটা পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার বা সংক্ষেপে আইএসবিএন (ISBN)। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতিতে বইয়ের সংখ্যার হিসেব রাখতে প্রতিটি বইয়ে একটি নম্বর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিকভাবে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এখন আন্তর্জাতিক আইএসবিএন সোসাইটি এটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে একটি বইয়ের নাম্বারে চারটি অংশ থাকে, যা ১০ বা ১৩ ডিজিটের হতে পারে।

প্রথম অংশটি যে দেশ থেকে প্রকাশিত তার বা ভাষার কোড, দ্বিতীয়টি প্রকাশকের কোড, তৃতীয়টি আইটেম নাম্বার কোড আর একেবারে শেষেরটি হয় চেক ডিজিট। যেমন- একটি বইয়ের উপর লেখা আছে ISBN ৯৮৪-০৭-৪৫৪৫-১০। এর অর্থ - প্রথম অংশটি (৯৮৪) বাংলাদেশের কোড, দ্বিতীয়টি (০৭) বাংলা একাডেমির কোড, তৃতীয়টি (৪৫৪৫) হচ্ছে ওই প্রকাশনীর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এবং সর্বশেষে (১০) হচ্ছে চেক ডিজিট। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরো তথ্য জানতে যাও http://www.nanl.gov.bd/ -এ।

নামতার ছড়া

সানোয়ার শান্তি

দুই এক কে দুই ওই ফুটেছে জুঁই
দুই দু গুণে চার মুখ করো না ভার
তিন দু গুণে ছয় ভাঙব সব ভয়
চার দু গুণে আট নৌকা বাঁধার ঘাট
পাঁচ দু গুণে দশ ভাসছে জলে হাঁস
ছয় দু গুণে বারো নীল রংটি গাড়ো
সাত দু গুণে চৌদ্দ কান করো না বদ্ধ
আট দু গুণে ষোলো ঘরের দুয়োর খোলো
নয় দু গুণে আঠারো মোটর চলে গো গো
দশ দু গুণে কুড়ি উড়ছে দেখো ঘুড়ি।

ONE থেকে TEN

রীনা তালুকদার

ONE TWO THREE
পাড়ি দাও গিরি
FOUR FIVE SIX
বের কর ট্রিক্স
SEVEN EIGHT NINE
ভুল করলে হবে ফাইন
TEN মানে দশ
দেখাও তোমার সাহস।

কৈশোর

আফনান আহমেদ রাশেদ

কৈশোর মানে, নিজ নতুন স্বপ্ন বুনে রাখা,
কৈশোর মানে, কল্পনার ছবি মনের ভিতর আঁকা।
কৈশোর মানে, মাঠ পেরিয়ে মাঠের প্রান্তে চলা
কৈশোর মানে, আড্ডার ছলে মনের কথা বলা।

কৈশোর মানে, নাটাই হাতে নীল আকাশে ঘুড়ি,
কৈশোর মানে, তেপান্তরে ইচ্ছে ঘুরাঘুরি।
কৈশোর মানে, দুরন্তপনায় নদী সাঁতরে পাড়ি,
কৈশোর মানে, ঢিল ছুড়ে ভাঙা রসের হাড়ি।

কৈশোর মানে, এক লাফেতে গাছের উপর ওঠা,
কৈশোর মানে, নৌকা চালানো হাতে নিয়ে বৈঠা।
কৈশোর মানে, ক্লান্তিহীন সকাল, সন্ধ্যা, রাত,
কৈশোর মানে, বন্ধুত্বের টানে রাখা কাঁধে হাত।

একাদশ শ্রেণি, তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

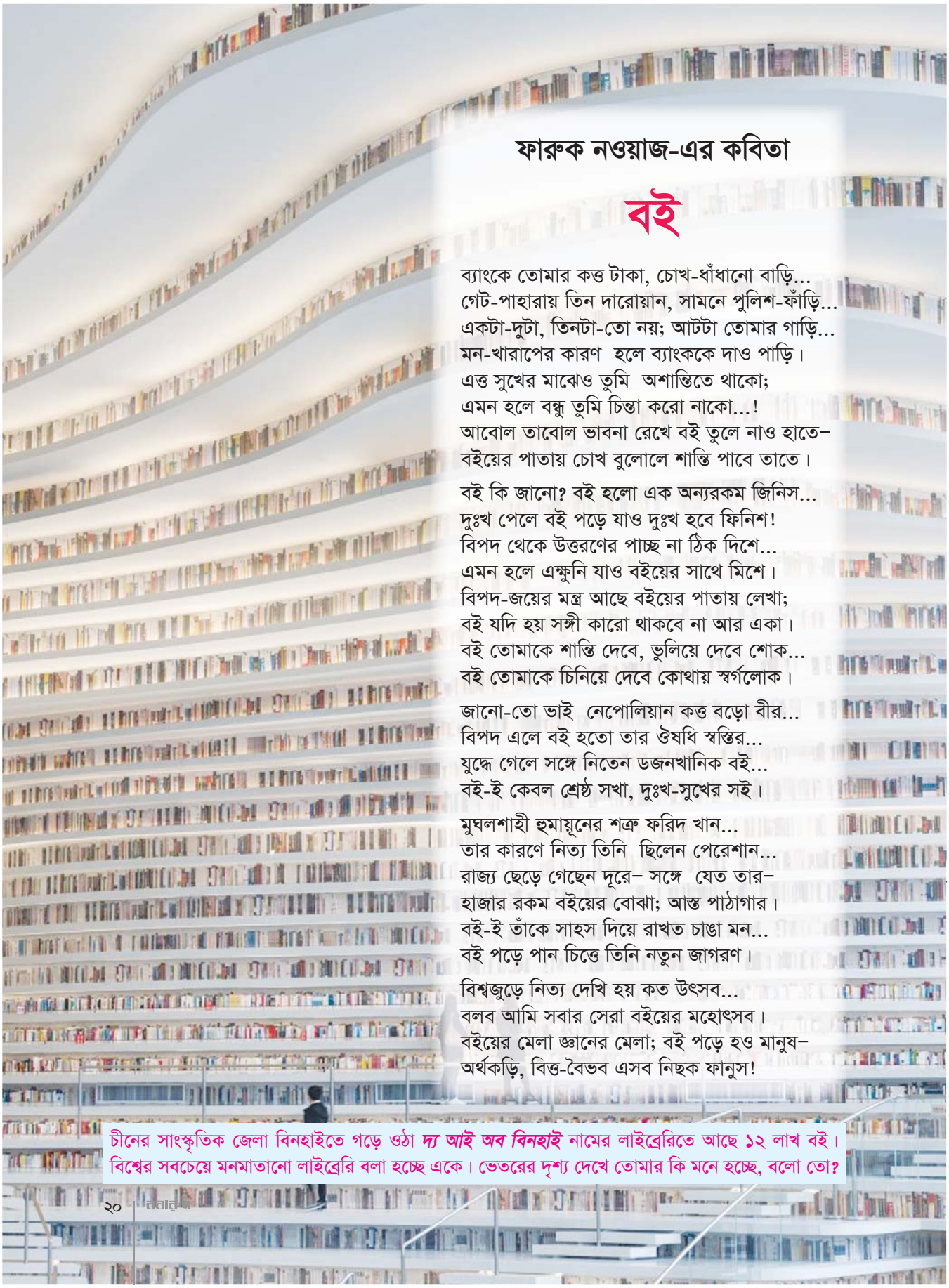

ফারুক নওয়াজ-এর কবিতা

বই

ব্যাংকে তোমার কত্ত টাকা, চোখ-ধাঁধানো বাড়ি...
গেট-পাহারায় তিন দারোয়ান, সামনে পুলিশ-ফাঁড়ি...
একটা-দুটা, তিনটা-তো নয়; আটটা তোমার গাড়ি...
মন-খারাপের কারণ হলে ব্যাংককে দাও পাড়ি।
এত্ত সুখের মাঝেও তুমি অশান্তিতে থাকো;
এমন হলে বন্ধু তুমি চিন্তা করো নাকো...!
আবোল তাবোল ভাবনা রেখে বই তুলে নাও হাতে–
বইয়ের পাতায় চোখ বুলোলে শান্তি পাবে তাতে।

বই কি জানো? বই হলো এক অন্যরকম জিনিস...
দুঃখ পেলে বই পড়ে যাও দুঃখ হবে ফিনিশ!
বিপদ থেকে উত্তরণের পাচ্ছ না ঠিক দিশে...
এমন হলে এক্ষুনি যাও বইয়ের সাথে মিশে।
বিপদ-জয়ের মন্ত্র আছে বইয়ের পাতায় লেখা;
বই যদি হয় সঙ্গী কারো থাকবে না আর একা।
বই তোমাকে শান্তি দেবে, ভুলিয়ে দেবে শোক...
বই তোমাকে চিনিয়ে দেবে কোথায় স্বর্গলোক।

জানো-তো ভাই নেপোলিয়ান কত্ত বড়ো বীর...
বিপদ এলে বই হতো তার ঔষধি স্বস্তির...
যুদ্ধে গেলে সঙ্গে নিতেন ডজনখানিক বই...
বই-ই কেবল শ্রেষ্ঠ সখা, দুঃখ-সুখের সই।

মুঘলশাহী হুমায়ুনের শত্রু ফরিদ খান...
তার কারণে নিত্য তিনি ছিলেন পেরেশান...
রাজ্য ছেড়ে গেছেন দূরে– সঙ্গে যেত তার–
হাজার রকম বইয়ের বোঝা; আস্ত পাঠাগার।
বই-ই তাঁকে সাহস দিয়ে রাখত চাঙা মন...
বই পড়ে পান চিত্তে তিনি নতুন জাগরণ।

বিশ্বজুড়ে নিত্য দেখি হয় কত উৎসব...
বলব আমি সবার সেরা বইয়ের মহোৎসব।
বইয়ের মেলা জ্ঞানের মেলা; বই পড়ে হও মানুষ–
অর্থকড়ি, বিত্ত-বৈভব এসব নিছক ফানুস!

চীনের সাংস্কৃতিক জেলা বিনহাইতে গড়ে ওঠা ***দ্য আই অব বিনহাই*** নামের লাইব্রেরিতে আছে ১২ লাখ বই। বিশ্বের সবচেয়ে মনমাতানো লাইব্রেরি বলা হচ্ছে একে। ভেতরের দৃশ্য দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, বলো তো?

৫ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

বইয়ের বাড়ি মজার বাড়ি

মিনহাজ উদ্দীন আহাম্মদ

তথ্য এবং জ্ঞান সবসময়ই পরিবর্তনশীল। তাই একজন মানুষ এবং একটি জাতির পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা। জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার অন্যতম বাহন হিসেবে পরিচিত। কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে যেমন বাহন লাগে তেমনি আদর্শ সমাজ, সভ্য ও শিক্ষিত জাতি গড়তে হলেও লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মোট কথা, লাইব্রেরি হচ্ছে বইয়ের বাড়ি। খুব মজার বাড়ি, তাই না?

বই, লেখালেখি এবং লাইব্রেরি একটি অপরটির সাথে দারুণভাবে জড়িত। বই যেমন সেলফে সাজিয়ে রাখলে তার আসল উদ্দেশ্য হারায় তেমনি লাইব্রেরিতে সাজানো বই ও পাঠক ছাড়া গুরুত্ব হারায়। তাহলে কি করতে হবে? লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তে হবে অথবা নিয়ম মেনে বাসায় এনে বই পড়ে পুনরায় ফেরত দিতে হবে। আমরা সকলে যদি আমাদের সংগ্রহের বইগুলো অন্যকে পড়তে দেই তাহলেও অনেকের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার গঠবে।

এক একটি লাইব্রেরি যেন জ্ঞানের বিশাল এক ভূখণ্ড। Library শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Libre থেকে যার অর্থ বই। আর Library শব্দটির অর্থ হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বই, পুস্তক, জার্নাল পাণ্ডুলিপি, অডিও ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্ট সমূহ বিধিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে যাতে ব্যবহারকারী সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। মানুষ যখন সভ্যতার যাত্রা শুরু করে তখন থেকেই নিজেকে চিনতে ও জানতে আগ্রহী হয়। পরস্পরকে চেনার পর মানুষ তার পরিবেশকেও জানতে ও বুঝতে উৎসাহী হয়। মানুষের জানার আগ্রহ ক্রমে বেড়ে যায়। নতুন প্রাপ্তির আনন্দ নেশায় মানুষ উৎফুল্ল হয়ে উঠে। ক্রমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার হাজার হাজার তত্ত্বে ও তথ্যে ভরে উঠতে থাকে। এরূপ জ্ঞান স্মৃতিশক্তিতে ধরে রাখা এক সময় অসম্ভব হয়ে উঠে।

নবারুণ-এর গ্রাহক কুপন

এই অংশটুকু কেটে ডাকে পাঠাতে হবে অপর পৃষ্ঠার ঠিকানায়

গ্রাহকের নাম .....

ঠিকানা .....

৬ মাস	১২ মাস	প্রতি কপির মূল্য	মোট মূল্য
		২০/-	

গ্রাহকের স্বাক্ষর

তখন মানুষ তার সংগৃহীত জ্ঞান স্থায়ীভাবে ধরে রাখার মাধ্যম খুঁজতে থাকে। ফলে গাছের বাকল, প্যাপিরাস, শিলা, চামড়া প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। মানুষ তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির নানা তথ্যাদি এ সকল বস্তুতে বিস্তৃতভাবে লিখতে থাকে। এমন করে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার এবং বিস্তার লাভ করে। পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডার পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মানুষ এক সময় তীব্রভাবে অনুভব করে; এ অনুভব থেকেই এক সময় লাইব্রেরির উৎপত্তি ঘটে।

বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরিঃ

জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে এর যেমন অনেক শাখা-প্রশাখা হয়েছে তেমনি মানুষের জ্ঞানের পিপাসা নিবারণের জন্য লাইব্রেরিকে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন ভাবে যেমন:

ক. একাডেমিক লাইব্রেরিঃ যেখানে মূলত: কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বই, পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি রাখা হয় বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মিল করে।

খ. পাবলিক লাইব্রেরিঃ সমাজের সকল শ্রেণি ও বয়সের মানুষের প্রয়োজনকে গুরত্ব দিয়ে এখানে বিভিন্ন ধরণের বইপত্র সাজানো হয়। অধিকাংশ পাবলিক লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদা কর্নার থাকে।

গ. স্কুল লাইব্রেরিঃ স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে সাধারণ জ্ঞান,বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের বই এবং পত্রিকা রাখা হয়।

ঘ. বিশেষ ধরনের লাইব্রেরিঃ কোনো বিশেষ পেশার মানুষের প্রয়োজনকে গুরত্ব দিয়ে এখানে বইপত্র পাওয়া যায় যেমন– ব্যবসা সংগঠনের অফিস, হসপিটাল, সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিগুলো বিশেষ ধরনের লাইব্রেরি।

সংগীতের লাইব্রেরি

প্রাচীনকালে যে সকল সভ্যতাগুলো শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন করেছিল তার সকল সভ্যতাতেই কিছু প্রাচীন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি বিকশিত হয়েছিল। প্রচীনকাল থেকেই সভ্যতাগুলো দেখলে বোঝা যায়, যে জাতির লাইব্রেরি যত উন্নত ছিল সেই জাতি তত উন্নত ছিল। নিচে কয়েকটি প্রাচীন লাইব্রেরির বর্ণনা দেওয়া হলো।

অসুরবানি পাল লাইব্রেরি

সম্রাট অসুরবানি পাল ছিলেন এ্যাসিরিয় সম্রাট। প্রাচীনকালে তিনি বেবিলনিয়া সুমেরিয়া (বর্তমান ইরাক এবং উত্তর এশিয়া) অঞ্চলের শাসক ছিলেন।

ঠিকানা

বিক্রয় ও বিতরণ শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

পোড়া মাটির ফলকে লেখা

তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে অসুরবানি পাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রায় ২৬০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখনকার দিনে মানুষ মাটি দিয়ে তৈরি একটি বিশেষ ধরনের লিখন উপকরণ ব্যববহার করত। মাটি যখন নরম অবস্থায় থাকত তখন তাতে চিন্তা চেতনা লিখে আগুনে পুরিয়ে ক্লে ট্যাবলেট (Clay Tablet) তৈরি করা হতো। এই লাইব্রেরিতে বইপুস্তক ছিল না, তবে ক্লে ট্যাবলেট, প্যাপিরাস, পার্চমেন্ট, ভেলাম ও পাথরের বইয়ের সংগ্রহ ছিল। এই লাইব্রেরিতে পৌরানিক কাহিনি, ধর্মীয় কাহিনি, ইতিহাস, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় বেশি ছিল। সকলেই এ লাইব্রেরিটি ব্যবহার করতে পারত। পোড়া মাটির চাকতি বা ক্লে ট্যাবলেট (Clay Tablet) গুলো খুবই শক্ত ছিল। তাই হাজার হাজার ক্লে ট্যাবলেট আজও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি

প্রায় ২৩০০ বছর পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি বর্তমান মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন মিশরের

যুদ্ধে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের আঁকা চিত্র

রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। মূলত: সেখানে গ্রিকরা বাস করত এবং মিশর ছিল গ্রিক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। রাজা প্রথম টলেমির একক প্রচেষ্টাতেই এটি অনেকগুলো ভবনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। যেমন হলঘর, পড়ার ঘর, খাবার ঘর, মন্দির ইত্যাদি একসঙ্গে যুক্ত আকারে ছিল। তখনকার যুগের পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিকরা এ লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করতেন। বিভিন্ন সময়ে রাজাদের যুদ্ধের কারণে পৃথিবীর বিস্ময় এই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংস হয়।

নালন্দা লাইব্রেরি

প্রাচীন কালে ভারতের বিহার রাজ্যের নালন্দা মহাবিহারেই গড়ে উঠেছিল নালন্দা মহাবিহার লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে সংগ্রহ সমূহের মধ্যে অধিকাংশই ছিল

নালন্দা লাইব্রেরির ধ্বংসাবশেষ

বৌদ্ধ ধর্ম সমন্ধীয় মূল বই ও সংশ্লিষ্ট বইয়ের আলোচনা গ্রন্থ। এছাড়া অন্যান্য সংগ্রহশালার মধ্যে ছিল বেদ, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসা বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সমন্ধীয় বই। উল্লেখিত সামগ্রীর বেশির ভাগ ছিল কাপড়ের বাঁধাই এবং তালপাতার উপর লেখা।

কার্ডোভা লাইব্রেরি

দশম শতাব্দীতে স্পেনের কার্ডোভা নগরীতে কার্ডোভা লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিকদের মতে সেখানে প্রায় চল্লিশ লাখের এক বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল। সে সময় এই লাইব্রেরি ব্যবহার করার জন্য মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন লোক আসত। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ১০০ জনের উপর কর্মচারী নকলনবিশ ছিলেন যাদের

কাজ ছিল বিভিন্ন ভাষার বই আরবিতে অনুবাদ করা। মূলত এই প্রাচীন লাইব্রেরিটি ব্যবহার করেই ইউরোপে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে অনেক উন্নয়ন হয়েছিল। ১০০২ খ্রিষ্টাব্দে স্প্যানীয়দের আক্রমণে কার্ডোভা লাইব্রেরিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

এটি বিশ্বের বৃহত্তম আধুনিক লাইব্রেরি যা আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। ১৮০০ সালে আমেরিকার কংগ্রেস কর্তৃক কংগ্রেস ও আইন প্রণেতাদের ব্যবহারের জন্য এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মাত্র ৯৬৪টি বই ও ৯টি ম্যাপ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ৩৫ একর আয়তনের এ লাইব্রেরিতে ৩৪ মিলিয়ন খণ্ড বই এবং পুস্তিকাসহ এই লাইব্রেরির মোট সংগ্রহ ১১০ মিলিয়ন আইটেমের বেশি। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে এই লাইব্রেরির তথ্য সেবা গ্রহণ করা যায়। এই লাইব্রেরির ওয়েব সাইটে (https://www.congress.gov/) গিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে লাইব্রেরিটি ব্যবহার করা যাবে।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি

১৭৫৩ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই লাইব্রেরিতে প্রায় লক্ষাধিক ইলেক্ট্রনিক প্রকাশনা রয়েছে। ফরম পূরণ করে যে-

কোনো মানুষ এই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে। কোনো বই এখানে ধার প্রদান করা হয় না কারণ এটি একটি রেফারেন্স লাইব্রেরি অর্থাৎ এখানকার বই ও তথ্যবহুল প্রকাশনা গবেষণার কাজে ব্যবহার হয়। এই লাইব্রেরির ওয়েব সাইটটি হলো http://www.bl.uk/

বিবলিওথেক ন্যাশনেইল ফ্রান্স

বিবলিওথেক ন্যাশনেইল ফ্রান্সের জতীয় লাইব্রেরি যা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত। ১৫০০

খ্রিষ্টাব্দে একটি জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৫ সালে এই লাইব্রেরিকে বিবলিওথেক ন্যাশনেইল ফ্রান্স অথাৎ ফ্রন্সের জাতীয় লাইব্রেরি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ লাইব্রেরিতে ৪০ মিলিয়ন বই, ১ লক্ষ ৮০ হাজার বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি, ৪ লক্ষ এর অধিক ম্যাপ, ৩৩ হাজার এর উপর সংগীত ও অডিও ভিজুয়াল উপকরণের উপর সংগ্রহ রয়েছে। এটি মূলত একটি গবেষণা লাইব্রেরি যা সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

যে-কোনো ব্যবহারকারী এই লাইব্রেরিটি ব্যবহার করতে পারেন। অনলাইনের মাধ্যমে এই পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে এই লাইব্রেরি ব্যবহার করা যায়। এই লাইব্রেরির ওয়েব সাইটটি হলো http://www.bnf.fr

প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা গুলো দেখলে বোঝা যায়, যে জাতির লাইব্রেরি যত উন্নত ছিল সেই জাতি তত উন্নত ছিল।

লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা

বড়ো লাইব্রেরিগুলোতে বইগুলো সাজানো থাকে। ফলে আগ্রহী পাঠক সহজেই প্রয়োজনীয় বইটি খুঁজে নিতে পারেন। ক্যাটালগও রাখা হয় বই খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে। আর লাইব্রেরিয়ানসহ অন্যান্য কর্মীগণ তো আছেনই। ইদানিংকালের লাইব্রেরিগুলোয় অবশ্য ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব লাইব্রেরিগুলোয় বইয়ের সাথে একটি বারকোড স্টীকার লাগানো থাকে। যেটি বই ইস্যু করা এবং ফেরত নেওয়ার সময় স্ক্যান করে ডাটাবেজ আপগ্রেড করা হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সহজেই বলে দেওয়া যায় কোন বইটি বর্তমানে লাইব্রেরিতে আছে আর কোনটি নেই। লাইব্রেরিগুলোয় পত্রিকা, জার্নাল, রেফারেন্স বই ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা এলাকা থাকে। শিশুদের জন্যও আলাদা একটি এলাকা রয়েছে শাহবাগের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে। অবশ্য এক কক্ষবিশিষ্ট লাইব্রেরিও হতে পারে। পাড়া-মহল্লার লাইব্রেরিগুলো সাধারণত এক কক্ষ বিশিষ্টই হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ আকারের পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রশিক্ষিত লাইব্রেরিয়ান থাকেন। তথ্য ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার পর একজন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে চাকুরি পেতে পারেন। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটধারী যে কেউ তথ্য ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রিও নিতে পারেন।

বই ধার নেওয়া

সব লাইব্রেরিতে বই ধার নেওয়ার সুযোগ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি থেকে সাধারণত বই ধার নেবার সুযোগ দিয়ে থাকে। বই ধার নেবার পূর্বশর্ত হচ্ছে সদস্য হওয়া। বাংলাদেশের সকল জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি আছে এবং বেসরকারিভাবেও অনেক বড়ো বড়ো পাঠাগার এবং লাইব্রেরি আছে। ঢাকায় অবস্থিত বড়ো লাইব্রেরিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জেনে নাও, বন্ধুরা।

বাংলাদেশের লাইব্রেরিসমূহ

সারাদেশেই লাইব্রেরি আছে তবে মূলত ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করেই বড়ো লাইব্রেরিগুলো গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিও রয়েছে যেমন- ব্যান্ডসডক লাইব্রেরি, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি। বৃটিশ কাউন্সিল, আমেরিকান কালচারাল সেন্টার, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার লাইব্রেরিও আছে এ শহরে। আর সবার কাছে পরিচিত পাবলিক লাইব্রেরি তো রয়েছেই। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি লাইব্রেরি পরিচালনা করছে। আর স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগেও লাইব্রেরি পরিচালিত হচ্ছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের লাইব্রেরিও অত্যন্ত কাজের। তবে এখন পর্যন্ত সব স্কুলে লাইব্রেরি নেই।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় লাইব্রেরি

এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে ৩১ হাজারের বেশি প্রকাশনা রয়েছে। এখানে ১৮ হাজারের বেশি বই অন লাইনে রয়েছে। এখানে ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সেবাও প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় লাইব্রেরির ওয়েব সাইট ঠিকানা http://lib.pmo.gov.bd এবং ফেসবুক ঠিকানা https://www.facebook.com/pmolibrarybd/ পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় লাইব্রেরি অনলাইনে ব্যবহার করা যায়।

ভিন্নধর্মী লাইব্রেরি

অন্য সবকিছুর মতো ব্যতিক্রমী লাইব্রেরিও রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশে অনেক বই বিক্রেতা দোকানের নামের সাথে লাইব্রেরি শব্দটি জুড়ে দেয় যা কোনো অর্থেই যেমন ঠিক নয় তেমনি আমরাও সচরাচর বলে থাকি ঐ লাইব্রেরি থেকে বইটি কিনে এনেছি ইত্যাদি বলাও সঠিক

নয়। তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে বই বিহীন লাইব্রেরি আবার পাশাপাশি আছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি এবং পালান সরকারের চলমান লাইব্রেরি। জ্ঞান বিতরণ এবং প্রসারই এ ধরণের উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। এমনি কিছু ভিন্নধর্মী গ্রন্থাগারের তথ্য জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো লাইব্রেরি	ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে। চাইলে বইয়ের ফটোকপি করিয়ে নেওয়া যায়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানসহ গবেষণাভিত্তিক ৯ হাজার বই আছে এখানে। ঠিকানা- আনসারি ভবন, ২য় তলা, ১৪/২, তোপখানা রোড; ফোন: ৮৬১০৬৫৭
মহানগর লাইব্রেরি (জাতীয় গ্রন্থভবন)	ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সদস্য ফি ২০০ টাকা। ঠিকানা- জাতীয় গ্রন্থভবন, ৫/সি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৫ম তলা), ফোন: ৯৫৫৫৭৪৫, ৯৫৫৫৭৪৩ ই- মেইল: granthokendro@yahoo.com
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর লাইব্রেরি	শেরেবাংলানগরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ভবনের তৃতীয় তলায় চার হাজারেরও বেশি বই নিয়ে মাঝারি আকারের এই লাইব্রেরিটির অবস্থান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বই এবং জার্নাল এর বেশ সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে এখানে। এছাড়া রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। প্রধানত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি নির্ভর বই রয়েছে এখানে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা থেকে প্রকাশিত বুলেটিন, জার্নাল ইত্যাদিও রাখা হয় এখানে। সিডি, ডিভিডি ছাড়াও ফিল্মে ১৬ এবং ৩৫ মি.মি. ফরম্যাটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টরি রয়েছে লাইব্রেরিটিতে। শুক্রবার ও শনিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে এটি। ওয়েবসাইট: www.nmst.gov.bd
শিল্পকলা একাডেমি লাইব্রেরি	একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের তৃতীয় তলায় লাইব্রেরিটি অবস্থিত। এখানে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় সাত হাজারের বেশি বই আছে। বিশেষ করে চারুকলা, আলোকচিত্র ভাস্কর্য, নাটক, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বেশকিছু মূল্যবান দূর্লভ গ্রন্থ গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, চলচ্চিত্র, যাত্রা, হস্তশিল্পসহ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। ঠিকানা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা- ১০০০।
শিশু একাডেমি লাইব্রেরি	শিশুদের জন্য লেখা সকল বই এখানে পাওয়া যায়। যে কেউ এখানে বই পড়তে পারে এবং পছন্দের বই কিনতেও পারে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয় - পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ডিজিটাল লাইব্রেরি:

আজকাল কাগজে ছাপানো বই দিয়ে পাঠাগার গড়ার পাশাপাশি অনলাইনেও পাঠাগার হচ্ছে। দুর্লভ বইগুলোর পাশাপাশি নিত্যনতুন বইও ইন্টারনেটে আপলোড করা হচ্ছে। কেবল বিশ্বের বড়ো বড়ো লাইব্রেরিগুলোই নয়, প্রত্যেক দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনলাইন লাইব্রেরি গড়ে তোলা হচ্ছে। সেসব লাইব্রেরিতে ধর্মীয় বই, সাইন্স ফিকশন, নন-ফিকশন আর চলমান সময়ের নানা দিক নিয়ে সাজানো আছে বইয়ের পসরা। এমন অনেক পাঠাগার আছে যেগুলো থেকে ইচ্ছেমতো বই ডাউনলোড করে পড়া যায়। আবার তা বন্ধুবান্ধবের কাছে পাঠানোও যায়। অনলাইন পাঠাগার হোক কিংবা কাগজে ছাপানো বইয়ের পাঠাগার হোক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কোনোটিরই গুরুত্ব কম নয়।

পাবলিক লাইব্রেরি, শাহবাগ (সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)	লাইব্রেরিটিতে পৌনে দুই লাখের বেশি বই আছে, বর্তমানকালের সবগুলো পত্রিকা রাখা হয় এখানে। শিশুদের জন্য আলাদা একটি বিভাগ রয়েছে, এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য চারটি কম্পিউটার রয়েছে। বইয়ের অংশবিশেষ ফটোকপি করিয়ে নেবার ব্যবস্থাও আছে। লাইব্রেরিটি সবার জন্য উন্মুক্ত। লাইব্রেরিটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে, তবে কেবল রোববার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে।
জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস	শেরেবাংলা নগর ঢাকায় এই লাইব্রেরিটির অবস্থান। তিন লাখের বেশি বই আছে এখানে। শতবছরের চেয়েও পুরোনো, এমনকি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এমন বই যেমন আছে, তেমন সম্প্রতি প্রকাশিত বইও আছে এখানে। এছাড়া রয়েছে তিন হাজারের বেশি মানচিত্র। দেশি সংগ্রহের পাশাপাশি বিদেশি প্রকাশনার ক্ষেত্রেও লাইব্রেরিটিকে বৃহত্তম বলা যায়। এ লাইব্রেরির সদস্য হওয়া যায়।
ব্যান্সডক লাইব্রেরি	কেবল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বই আছে এখানে। চাইলে বইয়ের অংশবিশেষের ফটোকপি নেওয়া যায়। এছাড়া এখানে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর সুযোগ আছে। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি	বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ কমপ্লেক্স ভবনের পাঁচ তলায় লাইব্রেরিটির অবস্থান। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এটি সকাল ১০টা থেকে রাত ৮.৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শুক্রবার এবং রবিবার এটি সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা ওয়েব সাইট: www.ifclibrary.com
মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর লাইব্রেরি	জাদুঘর ভবনের তিনতলায় লাইব্রেরিটির অবস্থান। প্রধানত মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা ৩০০০ হাজারেরও বেশি বইয়ের সংগ্রহ আছে এখানে। প্রতি বছরই মুক্তিযুদ্ধের ওপরে লেখা নতুন বইগুলো এ লাইব্রেরির জন্য সংগ্রাহ করে সংগ্রহকে আরও সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এখান থেকে বই বাসায় নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

বই বিহীন লাইব্রেরি

দক্ষিণ কোরিয়ায় পাবলিক, একাডেমিক এবং স্কুল লাইব্রেরিতে কোনো ছাপানো বই নেই। তাহলে

কীভাবে লাইব্রেরি- এ প্রশ্ন আসতেই পারে। এখানে সবল কিছুর ডিজিটাল সংগ্রহ রয়েছে যা থেকে পাবলিক কম্পিউটার এবং ই-রিডারের সাহায্যে পাঠক তার প্রয়োজনীয় সব কিছু পেয়ে যায়। দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃহৎ গবেষণাধর্মী লাইব্রেরির বেশিরভাগই বইবিহীন লাইব্রেরি। ভবিষ্যতের লাইব্রেরি হয়ত এমনি হবে। এখান থেকে পাঠ করা যে-কোনো বই-এর পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করে নিতে পারে।

হাইব্রিড লাইব্রেরি

প্রচলিত বইয়ের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স পদ্ধতিতে সংগৃহীত বই ম্যাগাজিন, পত্রিকা ইত্যাদির মিশ্রিত লাইব্রেরিই হলো হাইব্রিড লাইব্রেরি। এসকল ক্ষেত্রে সিডিরম এবং ইবুক এর সাথে ছাপানো বইও একই জায়গায় থাকে। পাঠকদের সুবিধার্থে এ সকল কিছুর আয়োজন করা হয়েছে।

ভৌতিক লাইব্রেরি

হয়ত ভাবছ এটা আবার কী ধরনের লাইব্রেরি! ভয় পাওয়ার কারণ নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেই লেজার প্রযুক্তি ইলেক্ট্রনিক কালার এর বিশেষ এফেক্ট এবং গ্রাফিক্স এর সমন্বয়ে এক ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করা হয়। কেউ যদি কম্পিউটারে

ডাইনোসরের ইতিহাসের বর্ণনা পড়ে এবং সাথে ভিজুয়াল বাটনে পুশ করে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালে বড়ো স্ক্রীনে চলমান ডাইনোসর সামনে চলে আসে বিষয়টি কেমন লাগবে। এমনি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক যাদুঘরে জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার থেকেও অনুরূপ একটি লাইব্রেরির মতো মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক কিছু জানা যায়।

ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি

বিশ্বের অনেক দেশেই স্থায়ী লাইব্রেরি ছাড়াও মানুষের দোরগোড়ায় বই পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি রয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ৩০ টি গাড়ি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি তৈরি করেছে প্রতিটি গাড়িতে ৫০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত বই থাকে। ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্ট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয় এই লাইব্রেরি। সদস্যরা এখানে বই ধার নিয়ে পড়ার সুযোগ পান। ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির সদস্য হতে হলে ১০০-২০০ টাকা জামানত হিসেবে দিতে হবে, আর মাসিক চাঁদা ১০ টাকা। পৃথিবীর অনেক দেশে ঘোড়া এবং উটের পিঠে করে বই নিয়ে ও লাইব্রেরি চালু আছে।

লাইব্রেরিতে ভাষা চুপ করে আছে, মানবাত্মার অমর কথা কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পরে আছে। মহাপুরুষদের কণ্ঠই হাজারো ভাষায়, হাজার বছরের মধ্য দিয়ে এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। লাইব্রেরি পদ্ধতি যদি প্রবর্তন না হতো, তাহলে বোধহয় সভ্যতা এতদূর এগিয়ে আসত কিনা তা অনেক মনীষী সংশয় পোষণ করে থাকেন। কাজেই নিজকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে হলে আমাদের বেশি বই পড়তে হবে আর সেজন্য লাইব্রেরি হতে পারে সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকরী মাধ্যম।

তো, বন্ধুরা, চলে এসো বইয়ের বাড়ি। এমনকি তোমার বাড়িটাকেও বদলে ফেলো। বানিয়ে ফেলো বইয়ের বাড়ি। কেননা, এর চেয়ে মজার বাড়ি যে আর হয় না।

মোবাইলটা হবে কার

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

মোবাইল নিয়ে কাড়াকাড়ি
ভাইয়া করে মারামারি
মা বলেন, মোবাইল দাও তাড়াতাড়ি
ফোন করতে হবে মামাবাড়ি!
বাবা বলেন, মোবাইল নিয়ে করোনা আহাজারি
জলদি গিয়ে খাও মাছের তরকারি,
না খেলে আমিও নিব আড়ি
তোমায় ছেড়ে যেতে হবে বাড়ি।
থাকবে তুমি বৃষ্টিতে, ভিজবে জামা অশ্রুতে।

তৃতীয় শ্রেণি, বিএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা।

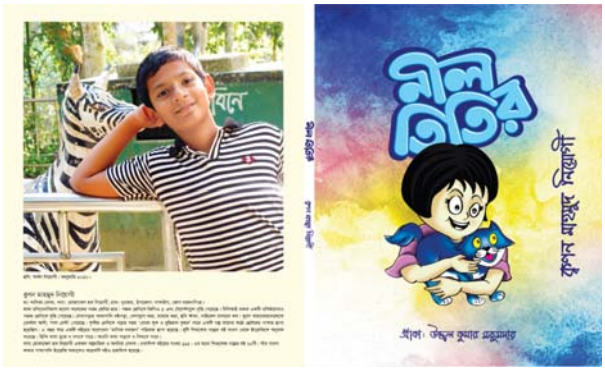

বইমেলায় খুদে লেখকের বই

'নীল তিতির' আমরা গল্প আকারে পড়েছিলাম ২০১৭ সালের নবারুণ-এর বিজয় দিবস সংখ্যায়। খুব আনন্দ হচ্ছে জেনে, 'নীল তিতির' এখন আস্ত একখানা বই। আর সে কী যেনতেন বই! উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের আঁকা দারুণ ছবিতে ঝলমল করছে বইটা। প্রকাশিত হয়েছে কালান্তর প্রকাশনী থেকে। দাম মাত্র ১০০ টাকা।

কেবল মাত্র ক্লাস এইটে পড়া কৃণন উপহার দিয়েছে 'নীল তিতির'। আরো অনেক মজার লেখা দিয়ে পাঠকদের মুগ্ধ করবে কৃণন। নবারুণ-এর পক্ষ থেকে ওর জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

এখানে নবারুণ পাওয়া যায়

সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
বায়তুল মোকাররম মার্কেট, ঢাকা
মোবাইল নং: মিলন ১৭১০৮০৪৫৬৫

পড়ার ঘর

শফিকুল ইসলাম শফিক

পড়ার ঘরটা ভিন্ন রে ভাই ভিন্ন আয়োজন
ভিন্নভাবে সাজাতে হয় দেখলে ভরে মন।
খোকন সোনার মনের মতো পড়ার ঘরের সাজ
স্বপ্ন দেখে মানুষ হবার পড়ালেখাই কাজ।

আউলা ঝাউলা রাখে না সে ঘরটা ছোটো হোক
একটু দেখে মুগ্ধ হবে জানি সকল লোক।
অনেক সময় পড়ার জন্য এইখানেতে রয়
আলো-বাতাস ঘরে আসে মনটা কোমল হয়।

বই-খাতা সে তাকে রাখে খুঁজলে সবই পায়
জানালার ওপাশে টেবিল পড়তে মনে চায়।
বিকেল বেলা সব শিশুদের ডাকে খেলার মাঠ
সন্ধ্যা নামার আগেই ফিরে আবার শুরু পাঠ।

খোকা খুকু তোমরা সবে পড়তে যদি চাও
সবার আগে পড়ার ঘরটা নাও গুছিয়ে নাও।
দাও মিশিয়ে মন মাধুরী সাজাও পড়ার ঘর
নইলে পাঠে মন টিকে না– বানাও মনোহর।

নবারুণ পড়ি মোবাইলে!!

আঁকা ও লেখা : নাজিবা সায়েম

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মাস্টার মাইন্ড স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

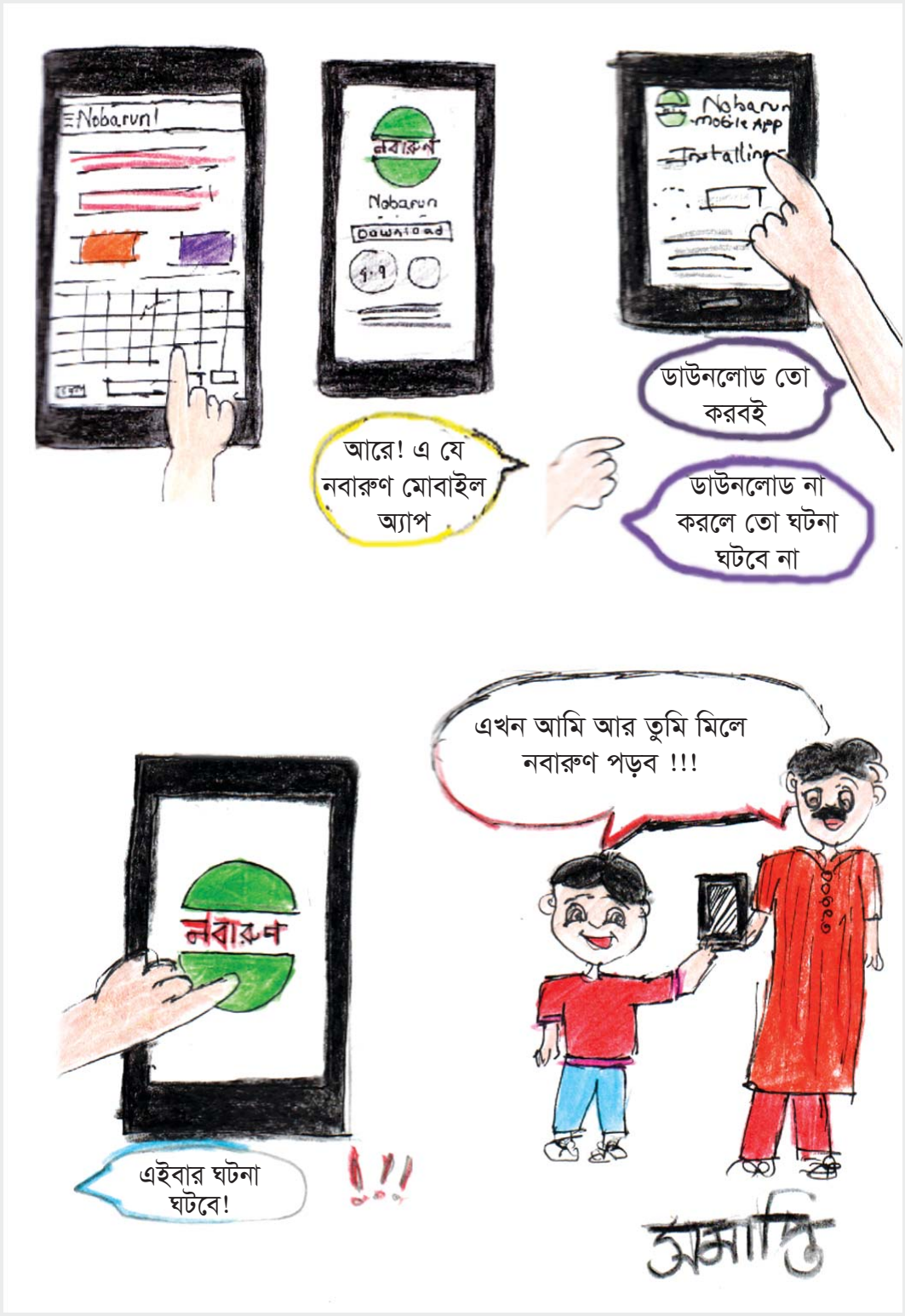

Nobarun
নবারুণ
Nobarun
Download
Nobarun mobile App
Installing
আরে! এ যে নবারুণ মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড তো করবই
ডাউনলোড না করলে তো ঘটনা ঘটবে না
নবারুণ
এইবার ঘটনা ঘটবে!
এখন আমি আর তুমি মিলে নবারুণ পড়ব !!!
সমাপ্তি

সব কিছুই জানা হবে

মুস্তফা হাবীব

দিনের পরে রাত্রি আসে সবাই জানি,
আষাঢ় মাসে নদীর বুকে বাড়ছে পানি।
শীতের পোশাক কেউ কি পড়ে গ্রীষ্মকালে!
সব কিছুরই নিয়ম আছে শান্ত তালে।

আজকে শিশু কালকে যুবক পড়শু বুড়ো
পিঠে খেতে লাগে আটা, চালের গুঁড়ো।
চাও কী হতে, মুখটি খুলে বলো এবার
দেবো আমি পরামর্শ যা যা দেবার।

পিতামাতার কথা শোনো দুষ্টুমি নয়
রুটিন মেনে পথে চলতে নেই কোনো ভয়।
স্কুলে যাও নিয়মিত ভদ্র বেশে
তোমার পক্ষে চন্দ্রতারা উঠবে হেসে।

স্বাস্থ্যনীতি জানলে তুমি সুখে রবে
ভুল করো না ভুলে জীবন পণ্ড হবে।
সত্য সুন্দর আলোর পথে মেলো ডানা
এই পৃথিবীর সবকিছুই হবে জানা।

মনটাকে ঠিক রাখা

সাইফুল ইসলাম সাইফ

আরাম করে ঘুমাও তুমি
দিচ্ছ চাদর মুড়ি,
রাখতে সতেজ শরীরটাকে
নেই তো ঘুমের জুড়ি।
চলছ তুমি ঘাসের উপর
হাঁটছ কোমল পায়ে,
স্বাদ মেটাতে ঘুরছ তুমি
নদীর ডিঙি নায়ে।
খাচ্ছ তুমি নানান খাবার
রাখছ সাথে পানি,
সাজছ তুমি রংবাহারি
মাখছ আতরদানি।
খেলছ তুমি বালির উপর
মেলছ সুখের পাখা,
এসব কিছুর হচ্ছে মানে
মনটাকে ঠিক রাখা।

নবম শ্রেণি, চেড়িয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়, শাহরাস্তি, চাঁদপুর

হবে ঠিক জয়

অমিতাভ মীর

ছোটো ছোটো কিছু আশা
কিছু ভালোবাসা,
কিছু চাওয়াপাওয়া
বুকে বাঁধে বাসা।

কিছু কিছু কথা ছোটো
জ্বলে যায় বুক,
ছোটো কিছু কথা শুনে
মনে জাগে সুখ।

চাওয়া আর পাওয়া
মেলে যদি ঠিক,
হাসি-রাশি ভরা ঠোঁটে
খুশির ঝিলিক।

মন কভু ভাঙে যদি
হারানোর ছলে,
ভুলে যেও ওই সব
তোমার না বলে।

বিশাল আকাশ তার
উদার ছায়ায়,
জড়িয়ে রেখেছে সব
নিবিড় মায়ায়।

লেখা আর পড়া হোক
জীবনের ধ্যান,
কথা আর কাজ মিলে
বেড়ে যাবে জ্ঞান।

নিখিল ভুবন জেনো
ছোটো কিছু নয়,
আশা বুকে কাজে নামো
হবে ঠিক জয়!

হেলেন কেলার ও দৃষ্টিহীনের 'ভাষা' ব্রেইল

কামাল হোসাইন

হেলেন কেলার এমনই এক নাম যা অন্ধ, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে এক আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। যুগে যুগে এই মহীয়সী নারীর রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে আগামীর পথচলার মন্ত্র। প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার এক জ্বলন্ত উদাহারণ হেলেন কেলার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা তাসকাম্বিয়া গ্রামে ১৮৮০ সালের ২৭ জুন জন্মগ্রহণ করেন হেলেন কেলার। পিতা আর্থার কেলার ছিলেন সামরিক বিভাগের একজন অফিসার। মা কেইট আডামসের ভালোবাসা ও আদরে বেড়ে ওঠা হেলেন শৈশবে ছিলেন ভীষণ চঞ্চল প্রকৃতির। কিন্তু তার এই চঞ্চলতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এক বছর সাত মাস বয়সে দুর্ভাগ্যজনক এক ঘটনা ঘটে যায় তাঁর জীবনে।

গোসল করানোর সময় মায়ের কোল থেকে হঠাৎ পড়ে যায় শিশু হেলেন। সেই আঘাতে সাময়িক জ্ঞান হারানোর পর তা ফিরে আসে তার মা লক্ষ করলেন, তার আদরের সন্তানের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছে। নিরুপায় পিতা-মাতা ডাক্তারের কাছে ছুটলেন। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানালেন, তার এই শারীরিক বিপর্যয়ের কারণ হলো মস্তিষ্ক ও পাকস্থলির আঘাত। আর এতে করে চিরদিনের জন্য শিশু হেলেনের জীবন থেকে হারিয়ে যায় তার কথা বলা, শোনা এবং দেখার শক্তি।

পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার শেষ নেই কন্যা হেলেনকে নিয়ে। এর কিছুদিন পর পিতা আর্থার পরামর্শ গ্রহণের জন্য তার কন্যাকে নিয়ে যান গ্রাহাম বেলের কাছে। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বেল জানালেন, হেলেন আর কোনোদিন চোখে দেখতে এবং কানে শুনতে পারবেন না। তবে গ্রাহাম বেল হেলেনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দেখে আর্থারকে হেলেনের জন্য যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলেন, যাতে স্বাভাবিক জীবনের কাছাকাছি একটি সুন্দর জীবন ফিরে পেতে পারেন হেলেন।

বেল বোস্টনের পার্কিনস ইনস্টিটিউশনে হেলেনকে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ ছিল অন্ধদের শিক্ষাদান করা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাক্তার হো। হেলেনের শিক্ষাগ্রহণের ভার তিনি নিজ হাতে তুলে নেন। তিনি হেলেনকে স্নেহ দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ ডাক্তার হো'র মৃত্যু হলে হেলেনের পিতা-মাতা পুনরায় তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। তখন পার্কিনস ইনস্টিটিউশনের নতুন ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব নেন মাইকেল অ্যাগানোস। তিনি হেলেনের সমস্ত কথা শুনলেন এবং অ্যানি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাথে হেলেনের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। হেলেনের সুখ্যাতি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ জানতেন। রবীন্দ্রনাথ হেলেনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

সুলিভ্যান ম্যানসফিল্ড নামের এক শিক্ষিকার হাতে হেলেনের জীবনকে আলোকিত করার দায়িত্ব দেন।

অ্যানিও ছোটোবেলা থেকে চোখে কম দেখতে পেতেন। পার্কিনস ইনস্টিটিউশনের সহযোগিতায় তার চোখে দু'বার অপারেশন করা হয়। তারপর থেকে তিনি স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পান। অন্ধকার জীবনের যন্ত্রণা অনুভব থেকেই তিনি অন্ধদের জন্য কাজ করার সংকল্প নেন জীবনের ব্রত হিসেবে।

অ্যানি অন্ধ এই শিশুকে স্পর্শের মাধ্যমে জগৎ চেনাতে লাগলেন। আলোর ছোঁয়া এবং অন্ধকারের অনুভূতির তফাৎ বোঝালেন। কল চালিয়ে হাতের ওপর বয়ে যাওয়া তরলকে চেনালেন 'পানি' বলে। একে একে পরিচয় ঘটল তার সাথে বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার, বিছানা ইত্যাদির সঙ্গে। আস্তে-আস্তে হেলেন শিখে নিতে থাকেন। হেলেন যে পদ্ধতির মাধ্যমে লেখাপড়া করতে থাকেন, তার নাম ব্রেইল পদ্ধতি। লুইস ব্রেইল আবিষ্কার করেন এই পদ্ধতি।

'ব্রেইল' হলো সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অন্ধরা আঙুলের স্পর্শের সাহায্যে পড়াশুনা করতে পারে। খুব অল্প সময়ে হেলেন ৩০টি শব্দ আয়ত্ত করে ফেলেন। কয়েক বছরেই হেলেন ইংরেজি, ল্যাটিন, গ্রিক, ফরাসি এবং জার্মান ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে তিনি ব্রেইল টাইপ রাইটারে লিখতে শেখেন। হেলেন এগারো বছর বয়সে এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে কথা বলার চর্চা করতে থাকেন। ধীরে-ধীরে চিকিৎসার মাধ্যমে তার বাকশক্তিও অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

বিশ বছর বয়সে হেলেন সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাসে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন, ভর্তি হন র‍্যাডক্লিফ কলেজে। কলেজে পড়ার সময় তিনি লেখেন তার প্রথম আত্মজীবনীমূলক রচনা 'Optimism'। চার বছর পর তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিএ পাস করেন। কলেজে স্নাতক হবার পর তিনি লেখেন তার আত্মজীবনীমূলক বই 'The story of my life', যেখানে তিনি তার জীবনের বিপর্যয়, লড়াই, অ্যানির কাছ থেকে শিক্ষালাভ, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার জীবনচিত্র তুলে ধরেন। আর এই রচনার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাপক খ্যাতিও অর্জন করেন। লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে তার নাম।

জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে হেলেন সাংবাদিকতা পেশায় তার কর্মজীবন শুরু করেন। বিভিন্ন সমালোচনায় একময় হেলেন সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে দেন। অ্যানি ও হেলেন পুনরায় দুজন দুজনের ছায়াসঙ্গী হয়ে কাজ করা শুরু করলেন। তারা বিভিন্ন জায়গায় ছোটো-ছোটো মঞ্চে বক্তৃতার আয়োজন করতেন। তার বক্তৃতায় সূক্ষ্মতা ও চিন্তার গভীরতা দেখে মুগ্ধ হন শ্রোতারা। কিছুদিনের মধ্যেই হেলেনের অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত তৈরি হলো।

এই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যানির দৃষ্টিশক্তি আস্তে-আস্তে লোপ পেতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই অ্যানি প্রায় অন্ধ হয়ে যান। এতে হেলেনের উপর চাপ বেড়ে গেল। অ্যানি তাকে প্রচুর সাহায্য করতেন। কিন্তু এই অবস্থায় হেলেন একাএকা কীভাবে সবকিছু সামলাবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

ফলে তিনি ডাক্তার গ্রাহাম বেলের সাহায্য চাইলেন। ডাক্তার বেল হেলেনকে নিজের কন্যার মতো স্নেহ করতেন। তাঁর নেশা ছিল দেশভ্রমণের। তিনি হেলেন ও অ্যানিকে সঙ্গে করে ইউরোপ গেলেন। এতে করে বিশ্বকে জানার আরেক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

হেলেন কেলার

মোহ্‌সেন আরা

হেলেন কেলার অন্ধ ছিলেন
আর যে ছিলেন বোবা,
কিন্তু তিনি মূর্খ ছিলেন
বলবে এমন কেবা?
তিনি বলেন, মনের দেখা
চোখের দেখার চেয়ে
বড়ো অনেক বলেন তিনি
জ্ঞানের আলোক পেয়ে।

হলো তাদের। হেলেনের প্রতিভার জন্য তিনি যখন যে দেশ ভ্রমণে গিয়েছেন, সে দেশের মানুষই তাকে অকুণ্ঠ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় সিক্ত করেছে। এভাবেই দেশ-বিদেশে বাড়তে থাকে তার অনেক অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা। রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই মুগ্ধ হতেন এই অসামান্য নারীর প্রতিভা দেখে।

এতকিছুর মাঝে একসময় হেলেন 'Deliverance' নামক বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জীবনের বিষাদের ওপর নির্মিত একটি চলচ্চিত্রে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও বাদ্যযন্ত্রের ওপর হাত রেখেই বলতে পারতেন কী ধরনের সুর বাজছে। গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে হাত দিয়ে অনায়াসে বলতে পারতেন কী সংগীত গাইছে। তার এমনই আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, বহুদিনের পরিচিত মানুষের সঙ্গে করমর্দন করে বলে দিতে পারতেন তার পরিচয়। দৃষ্টিহীন হয়েও তিনি নৌকা চালাতে, সাঁতার কাটতে পারতেন, খেলতে পারতেন দাবা ও তাস। এমনকি সেলাই পর্যন্ত করতে পারতেন তিনি!

১৯২২ সালে ডাক্তার বেলের মৃত্যুর পর তারই শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী হেলেন তার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। হেলেন এই প্রতিষ্ঠান ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশের বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে যা অর্থ উপার্জন হতো, তা দিয়ে বিভিন্ন দেশে পঞ্চাশটিরও বেশি অন্ধদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন হেলেন। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়ে হাজার হাজার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষালাভ করেছে। নিজেকে সফলভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পর আমেরিকার এক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানেই তাঁর পরিচয় হেলান কেলারের সঙ্গে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবিত থাকা অবস্থায় হেলেন শান্তিনিকেতনে আসতে পারেননি। ১৯৫৫ সালে ভারতে আসেন হেলেন। সেই সময়েই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হেলেনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৫০ সালে হেলেনের পঞ্চাশ বছরের কর্মময় জীবনকে সম্মান জানাতে প্যারিসে এক বিরাট সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। তখন তার বয়স সত্তর বছর। ১৯৫৯ সালে হেলেন জাতিসংঘ কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ১১টি বই রচনা করেন তিনি। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো– The story of my life (1903), The world I live in (1908), Let us have faith (1904), Teacher Annie Sullivan (1955), The open door (1957)।

যেভাবে এল ব্রেইল

শত শত বছর ধরে অন্ধ লোকেরা বাহ্যিক জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিতই ছিল। তারা পড়তে পারত না। কিন্তু উনিশ শতকে একজন আন্তরিক যুবক, অন্ধদের কথা চিন্তা করে একটা পদ্ধতি বের করেন, যেটা স্বয়ং তাকে ও হাজার হাজার অন্ধ ব্যক্তিদেরকে আশার আলো দেখিয়েছে। অন্ধ বলে একজন মানুষ পৃথিবীর সবকিছু থেকে বঞ্চিত থাকবে, তা তিনি মানতে পারেননি।

এই যুবকের নাম লুইস ব্রেইল। ১৮০৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে কুভ্রে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার বাবা সাইমন রেনে ব্রেইল বর্ম তৈরি করে সংসার চালাতেন। ছোটোবেলায় লুইস প্রায়ই তার বাবার কারখানায় গিয়ে খেলা করতেন। আর এখানেই একদিন এক ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। একদিন খেলতে খেলতে লুইস একটা সূচালো হাতিয়ার নিজের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এতে তার সেই চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। এর চেয়েও দুঃখজনক হলো, খুব দ্রুত তার অন্য চোখও সংক্রামিত হয়। মাত্র তিন বছর বয়সে লুইসের দুচোখই অন্ধ হয়ে যায়।

লুইসের জীবনটা যেন নষ্ট না হয়, সেজন্য লুইসের বাবা-মা ও সেখানকার গির্জার যাজক জ্যাকুস পলি

সেখানকার স্কুলে লুইসকে ভর্তি করে দেন। লুইস শুনে-শুনেই অনেক কিছু শিখে ফেলতেন। কয়েক বছরেই লুইস ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র হয়ে উঠলেন! কিন্তু ভালো ছাত্র হলে হবে কী, এভাবে পড়ালেখা করতে গিয়ে অন্ধত্ব তার জন্য একটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পড়ালেখা করার ওই পদ্ধতিটা ছিল যাদের চোখ আছে শুধু তাদের জন্য। তাই, ১৮১৯ সালে লুইসকে রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ব্লাইন্ড ইয়ুথ-এ ভর্তি করে দেওয়া হয়।

লুইস ব্রেইল দিয়েছেন দৃষ্টিহীনকে 'ভাষা'

ওই ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেনটিন হোয়াই প্রথম অন্ধদের পড়তে সাহায্য করার জন্য একটা পদ্ধতি বের করেন। অন্ধরা পড়ালেখা করতে পারবে না, সেই সময়ের লোকেদের এই ধারণাকে তিনি ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। হোয় প্রথমে মোটা কাগজের ওপর বর্ণমালার অক্ষরগুলো বড়ো আকারে উঁচু করে সাজিয়ে ছিলেন। এই পদ্ধতিটা যদিও খুব একটা ভালো ছিল না কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করেই পরে উন্নত পদ্ধতি বের করা হয়েছিল।

হোয়ের ছোটো লাইব্রেরিতে উঁচু করে তৈরি বড়ো অক্ষরের কিছু বই ছিল। আর সেখান থেকেই ব্রেইল এই বড়ো অক্ষরগুলো কীভাবে পড়তে হয়, তা শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এভাবে শিখতে অনেক সময় লাগবে এবং এই পদ্ধতি খুব একটা ব্যবহারিকও নয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো অক্ষরগুলো আঙুলের জন্য নয়, কিন্তু চোখের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তবে খুশির বিষয় হলো যে, একজন ব্যক্তি এই অসুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন, আর ব্রেইলকে সাহায্য করার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন।

১৮২১ সালে লুইস ব্রেইলের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর, তখন চার্লস বার্বিয়া নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা ক্যাপ্টেন ওই প্রতিষ্ঠানে আসেন। সেখানে তিনি পড়ার একটা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন, যেটাকে রাতে পড়ার পদ্ধতি বলা হতো। পরে এটাকে সনোগ্রাফি নাম দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি যুদ্ধের সময় ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে ওপর থেকে নিচের দিকে উঁচু করা ছটা বিন্দু ও পাশে সর্বোচ্চ দুটো বিন্দু দিয়ে সাজিয়ে অক্ষর বানানো হতো। আর এই অক্ষরগুলোকে স্পর্শ করে বোঝা যেত। পড়ার জন্য সংকেতলিপি ব্যবহার করার এই পদ্ধতির ব্যাপারে ওই স্কুলের সবাই-ই বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিল। ব্রেইল খুব উৎসাহ নিয়ে এই পদ্ধতিটা শিখেছিলেন এবং পরে এটাকে আরো উন্নত করেছিলেন কিন্তু এই পদ্ধতিকে ব্যবহারিক করার জন্য তাকে এর পেছনে লেগে থাকতে হয়েছিল অনেকদিন। তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন– বিভিন্ন মানুষ, তাদের ধ্যানধারণা, মতবাদ ও ঘটনা সম্বন্ধে জানার ক্ষেত্রে অন্ধত্ব যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমাকে অন্য পথ বের করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ওই সংকেতলিপিকে সংশোধন করে একটা সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি বের করেন, যেটাতে একটা কুঠুরিতে ওপর থেকে নিচে সর্বোচ্চ তিনটে বিন্দু ও পাশে সর্বোচ্চ দুটো বিন্দু দিয়ে সাজিয়ে অক্ষর তৈরি করতে হতো। ১৮২৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে লুইস ব্রেইল ছয় বিন্দু সংবলিত একটা পদ্ধতি বানানো শেষ করেন। তার নামেই এই পদ্ধতিটা আজকে পরিচিত।

ব্রেইল অক্ষর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এক হাত বা দু'হাত বুলিয়েই পড়া যায়। প্রত্যেকটা ব্রেইল কুঠুরির বিন্দুগুলোকে ৬৩ রকমভাবে সাজানো যায়। অতএব, ওই বিন্দুগুলোকে নির্দিষ্টভাবে সাজিয়ে বেশিরভাগ ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেকটা অক্ষর ও বিরাম চিহ্নগুলোকে লেখা যায়। ব্রেইল অক্ষরে নির্দিষ্ট

কিছু কুঠুরি আছে, বার বার লেখা হয় সেগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, অন্ধ লোকেরা কীভাবে হাতের স্পর্শের সাহায্যে মনে রাখেন? উত্তরটা হচ্ছে, বলা হয়ে থাকে কোনো মানুষের একটা ইন্দ্রিয় যদি বিকল হয়, তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলো অধিক শাণিত হয়। দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও মেধাশক্তি বা মস্তিষ্কশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে তাদের। তাই হাতের আঙুলের স্পর্শের সাহায্যে সংকেতগুলো একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর ব্রেনে চলে যায়। আর আমরা যেমন চোখ দিয়ে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলতে পারি, একইভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও হাতের স্পর্শের সাহায্যে শব্দ ও বাক্য ধারণ করতে পারেন এবং অনায়াসে পড়তে পারেন।

দশ বছরে 'স্পর্শ'

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্রেইল বইয়ের প্রকাশনা। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে স্পর্শ নামের একটি সংগঠন। এই সংগঠনটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ছেলে-মেয়েদের এগিয়ে নিতে নানাভাবে কাজ করছে। স্পর্শের ভাষায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বলে দৃষ্টিজয়ী। সংগঠনটি এ বছর এক দশক পূর্ণ করেছে।

স্পর্শ গত ৬ জানুয়ারি দৃষ্টিজয়ী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দাবা-সংগীত-বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী, ১০টি নতুন ব্রেইল বইয়ের মোড়ক উন্মোচনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দৃষ্টিজয়ী শিশুদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন, স্পর্শের প্রধান উদ্যোক্তা নাজিয়া জাবীন। তিনি স্পর্শের যাত্রার শুরুর ঘটনা এবং ব্রেইলে বই প্রকাশের পেছনের মানুষদের ত্যাগের বর্ণনা দেন।

দৃষ্টিজয়ীদের জন্য যে দশটি বই নিয়ে এল স্পর্শ

১. আঁখি এবং আমরা কজন- মো. জাফর ইকবাল
২. আমি তপু-মো. জাফর ইকবাল
৩. মা-আনিসুল হক
৪. ছোটোদের সুফিয়া কামাল-মালেকা বেগম
৫. স্যাং আর প্যাং-লুৎফর রহমান রিটন
৬. আম্পারার সহজ অনুবাদ-ফেরদৌস খান
৭. স্বপ্ন ডানা-মুহিত কামাল
৮. অনন্ত নিদ্রা-সোনিয়া হক
৯. আলপনার রান্না-আলপনা হাবীব
১০. লবীর রান্না-লবী রহমান
১১. কলঙ্ক ভাগী-শাহরিয়ার হোসেন
১২. সুন্দরবনের সাদা পাহাড়-আনিসা হক
১৩. স্বাস্থ্য তথ্য-নারী পক্ষ
১৪. হাঁসের পায়ে ঘুড়ি-নাজিয়া জাবীন।

লেখক ও অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল দৃষ্টিজয়ীদের উৎসাহ যোগাতে তিনটি গল্প বলেন। তিনি বলেন, 'আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলেছি, যিনি দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের কিন্তু বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে পড়াশুনা করেছেন।' তিনি বলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের দয়া বা করুণা নয়, একটুখানি সাহায্য তাদের অনেকদূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজিএমই-এর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা যারা সত্যকে সত্য বলতে পারি না, আসলে তারাই অন্ধ।'

কবিতার হাট

দরাও এখন বিত্‌টি

আহসানুল হক

তিন বছরের ‘হাসিন’
ধরে বায়না-ছল
‘আমার ডন্যে ডোকান ঠেকে
কিনবে টুমি বল’ !

বলটা কিনে দিলে পরে
বায়না ধরে ফের
‘ডাওনা কিনে কাতের-পুটুল
ডরির ডামা
রঙ্গিন বোটামের’ !

এভাবে তার বায়না বাড়ে
বাড়ে যে তার লিস্টি
কখনো বা ধরে বায়না
শোনাও আমায়
‘ডোয়েল পাখির শিত্‌টি’ !

তার আবদার যায় না ফেলা
কথাগুলো মিষ্টি
যায় লেগে যায় ঘাপলা ভীষণ
বায়না ধরে হঠাৎ যখন
‘দরাও এখন বিত্‌টি ’।

মশা মাছি

তানজিন দেলওয়ার খান (রিজ)

কত মশা কত মাছি
থাকে সদা কাছাকাছি
করে শুধু ভনভন
উড়ে উড়ে সারাক্ষণ।
তাড়া করলে যায় না
মাছি দুধের বায়না
মেজাজটা হয় যে গরম
মশা মাছির নেই শরম।

অষ্টম শ্রেণি, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনসিডিউট, বনশ্রী, ঢাকা।

ঘুরছে লাটিম

শরীফ সাথী

একটি লাটিম কেনা হলো
খরচা করে কড়ি,
লেচ্ পাকিয়ে তৈরি হলো
চার হাতের এক দড়ি।
সেই লাটিমের টোপর মাথায়
প্যাচ মুড়িয়ে,
পেরেক বেঁধে মোড়া হলো
ক্যাচ ঘুরিয়ে।
টাইট করে মুঠোম হাতে
লাটিম ছুড়ে,
ভু ভু ভু ভু শব্দ তুলে
যাচ্ছে ঘুরে।
অনবরত ঘুরছে লাটিম
দেখা যার,
শিশু কিশোর হাততালিতে
একাকার।

ভাষা

মো. তাসিন হোসেন

ভাষার জন্য যাঁরা
জীবন দিল দান
জানাই হাজার সালাম
ভুলবো না অবদান।

যাঁদের আত্মত্যাগে
বাংলা ভাষা পেলাম।
যতদিন রবে বাংলা ও বাঙালি
ততদিন রবে তাঁদের নাম

৭ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

নতুন পড়ুয়াদের জন্য
খুব সহজ গপ্‌প।

লাটিম

মো. রহমত উল্লাহ্

লাটিম খেলা চলছে। একসাথে খেলছে তিনজন। কেউ সুতা প্যাঁচায়। কেউ ছুড়ে মারে। লাটিম ঘুরে। ঝিম ধরে। পুনপুন করে। কেউ হাতে নেয়। তালুতে রাখে। তালুতেই ঘুরে লাটিম। দেখতে খুব ভালো লাগে। হানিফের হাতে ঘুরে। সাজিদের হাতে ঘুরে। তারা বাহাদুরি করে। তারা ডাট দেখায়। অপমান লাগে শিমুলের।

লাটিম ছুড়ে শিমুল। তেমন ঘুরে না। পড়ে যায় তাওড় খেয়ে। আবার হাতে নেয়। সুতা প্যাঁচায় লাটিমে। ছুড়ে মারে জোরছে। একটু ঘুরে। আগের মতোই। পড়ে যায় হেলেদুলে। আবার মারে। পড়ে যায়। আবার। একই।

শিমুল পারে না। বলাবলি করে সবাই। হাসাহাসি করে সবাই। চাতুরি করে হানিফ। খোঁচা মারে সাজিদ। শরম লাগে শিমুলের। জেদ হয়। নিজের উপর। নিজের লাটিমের উপর। চলে আসে বাড়িতে। তাকায় লাটিমের দিকে। দেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। খেয়াল করে পেরেকটা। লাটিমের নিচের পেরেক। পেরেকেই ঘুরে লাটিম। হুম, পেয়েছি।

কথা বলে নিজে নিজে। পেরেকটা মনে হয় বাঁকা। হুম, বাঁকাই তো। একটু বাঁকা আছে। তাই তো পড়ে যায়। ঘুরে না তেমন। কারণ পেয়ে গেছি। দেখা যাক কী করা যায়।

দোকানে যায় শিমুল। পরখ করে লাটিম। একটা দুইটা তিনটা। চারটা পাঁচটা ছয়টা। সাতটা আটটা নয়টা। বাছাই করে একটা। কাঠ ভালো। আকার ভালো। গা সমান। লাল দাগ দেওয়া। পেরেক সোজা। নিয়ে আসে সেটি।

উঠানে আসে শিমুল। হাতে নতুন লাটিম। সুতা প্যাঁচায়। ছুড়ে মারে। ওয়াও। ঘুরছে। আবার ঘুরায়। ওয়াও। আবার করে। আরো ভালো পারে। আবার করে। আরো ভালো পারে। ঝিম ধরে লাটিম। পুনপুন করে। হাতে তুলে শিমুল। তালুতে ঘুরায়। হা হা।

পরদিন। মাঠে যায় শিমুল। নিয়ে যায় নতুন লাটিম। হানিফ আসে। সাজিদ আসে। সবার হাতে লাটিম। শুরু হয় ঘুরানো। চলছে প্রতিযোগিতা। একসাথে ছুড়ছে সবাই। ঘুরছে সবার লাটিম। হানিফের লাটিম থেমেছে। সাজিদের লাটিম থেমেছে। শিমুলের লাটিম ঘুরছে।

সবাই তো অবাক। শুরু হলো আবার। লাটিম ঘুরছে। সবার হাতে হাতে। সাজিদের লাটিম থেমেছে। হানিফের লাটিম থেমেছে। তাদের মুখ মলিন।

শিমুলের মুখে হাসি। হাতে ঘুরছে লাটিম।

মজার রূপকথা

রাজার উপদেষ্টা

বিএম বরকতউল্লাহ

এক ছিল রাজা। তার ছিল ডজন খানেক উপদেষ্টা।

রাজার উপদেষ্টাগণ রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, রাজ্যে হু হু করে লোকসংখ্যা বাড়ছে। লোকজন ফসলি জমিতে বাড়িঘর করছে। এভাবে চলতে থাকলে রাজ্যে খাদ্য সংকট ও নানা সমস্যা দেখা দেবে। ফসলি জমিতে বাড়িঘর করা নিষিদ্ধ করে একটি আইন জারি করে দিলে কেমন হয় রাজামশাই?

বিকল্প ব্যবস্থা না করে ফসলি জমিতে বাড়িঘর করা নিষিদ্ধ করা হলে রাজ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে। এমন একটা বুদ্ধি বের করো যাতে সমস্যার সমাধান হবে আবার রাজ্যে সৃষ্টি হবে না কোনো অসন্তোষ। প্রত্যেকে দেবে একটি করে প্রস্তাব। তিনদিনের মধ্যে এর উত্তম সমাধান না দিতে পারলে গর্দান যাবে তোমাদের—বললেন রাজা।

উপদেষ্টাগণ পড়ে গেলেন ভীষণ চিন্তায়। তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বেরিয়ে গেলেন রাজদরবার থেকে। চিন্তা করতে করতে চলে গেল দুই দিন। এখনও কোনো সমাধান বের করতে পারলেন না। সময় যতই কমে আসছে, উপদেষ্টাগণ ততই ছটফট করতে লাগলেন। রাজার সমস্যার সমাধান বের না করতে পারলেও তারা নিজেদের রক্ষার জন্যে একটা বুদ্ধি বের করে ফেলেছেন। তা হলো, কেউ ব্যর্থ উপদেষ্টা হয়ে রাজার সামনে গিয়ে গর্দান দেবে না; যে যেদিকে পারে সেদিকে পালিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে একমত হলো সবাই।

রাজাকে সমস্যার সমাধান জানানোর আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। উপদেষ্টাগণ কোনো উপায় বের করতে না পেরে পালাবার আয়োজন করছেন। এমন সময় জলখাবার নিয়ে ঘরে এল এক দাসী। সে উপদেষ্টাদের দুরবস্থা দেখে বলল, আমি আপনাদের সমস্যার কথা জানি আবার এর সমাধানও জানি।

ওরা সমস্বরে বলল, কী বলতে চাস, বল, আমাদের জীবনমরণ সমস্যা।

দাসী বলল, এ রাজ্যে পতিত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য ডোবা-নালা। অসংখ্য বাড়িঘর তৈরি করা যায় এই ডোবা-নালাগুলো ভরাট করে। এতে প্রজাদের সমস্যার যেমন সমাধান হয় তেমনি প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ারও কোনো কারণ থাকে না।

দাসীর প্রস্তাবটা শুনে উপদেষ্টারা আনন্দে লাফালাফি করতে লাগল। তারা পালাবার পরিবর্তে দাসীর প্রস্তাবটা নিজেদের প্রস্তাব বানিয়ে বুক ফুলিয়ে রাজদরবারে গিয়ে হাজির হলেন।

রাজা বললেন, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তোমাদের প্রস্তাব পেশ কর।

প্রস্তাব তো মোটে একটা। আগে যে বলতে পারবে জয় হবে তার। উপদেষ্টাদের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আমি আগে বলি, এটা আমার বুদ্ধিতে নেওয়া প্রস্তাব, আরেকজন খিচকি মেরে বলল, আরে রাখো তো, কে বলেছে এটা তোমার নেওয়া প্রস্তাব? এটা তো আমার প্রস্তাব। তোমরা সরে যাও, বলতে দাও আমাকে। আরেকজন বলল, আমিই দাসীকে প্রস্তাব করার অনুমতি দিয়েছিলাম, এটা আমার...

এ কথা শুনে পেছন থেকে দুজন তার মুখ চেপে ধরে বলল, হায়! হায়! বলে কি! বলে কি! এই পাঁজিটা তো আমাদের শূলে চড়াবে দেখছি! একটা হ্যাঁচকা টানে সবার পেছনে নিয়ে গেল তাকে। কার কথা কে শোনে। একজন রাজার দিকে এক কদম এগিয়ে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রস্তাবটা বলার চেষ্টা করতেই আরেক উপদেষ্টা পেছন থেকে উড়ে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, চুপ চুপ, মিথ্যাবাদী কোথাকার, চুপ। মহারাজের অনুগ্রহ পাওয়ার ও গর্দান বাঁচানোর অধিকার আমারও আছে। আমার প্রস্তাব আমাকে বলতে দাও। কেউ থামে না-কেউ দমে না। শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি।

রাজা উপদেষ্টাদের কাণ্ড দেখে বিরক্ত হয়ে কতোয়ালকে আদেশ করলেন, প্রত্যেককে বন্দি করে আলাদা আলাদা কুঠুরিতে নিয়ে রাখা হোক। যেই কথা সেই কাজ। ক্লান্ত-শ্রান্ত উপদেষ্টাগণ আলাদা কুঠুরিতে বসে একা একা বিড়বিড় করতে লাগল।

রাজা গেলেন প্রথম কুঠুরির সামনে। বললেন, তোমার প্রস্তাবটা বলো।

প্রথমেই প্রস্তাবটা শোনানোর সুযোগ পেয়ে উপদেষ্টা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল। এই সুযোগে উত্তম প্রস্তাব গ্রহণে তার কী ভূমিকা ছিল তা পেশ করার লোভ সামলাতে পারল না। সে জ্ঞানীর মতো বলল, এই সামান্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের বিস্তর সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, তবে এত সময় দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন ছিল না রাজামশাই। আপনি নির্দেশ দেওয়ার পর পরই রাজদরবার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় এ কঠিন সমস্যার একটা সহজ সমাধান বের করে ফেলেছিলাম আমি। সমাধানের কথা আপনাকে সাথে সাথেই জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অন্যরা আমাকে বলতে দিল না। তারা বলল, সমস্যা সমাধানের জন্যে সময় আছে তিনদিন।

রাজা বিরক্ত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, প্রস্তাবটা কী তাই বলো।

উপদেষ্টা আবেগে অভিমানে বলতে লাগল, মহারাজ, প্রস্তাবটা শোনার পূর্বে এর আগের কাহিনি শোনা জরুরি। আমার প্রস্তাবটা এতই যুৎসই ও মঙ্গলজনক যে এটা অন্যসব উপদেষ্টার পছন্দ হয়ে যায় এবং তারা এ প্রস্তাবটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যার যার প্রস্তাব আকারে আপনার বরাবরে পেশ করার জন্যে নানা কূটকৌশল শুরু করে দেয়। আমার প্রস্তাবটা আমার কাছে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজা বিরক্ত হয়ে তার কথা শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। তিনি গেলেন পরের কুঠুরিতে। এ কুঠুরির উপদেষ্টাও সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব বলার আগে অন্যদের চেয়ে তাঁর গৌরবময় ভূমিকার কথা বলতে শুরু করল। রাজা চলে গেলেন পরেরটাতে। এভাবে রাজা এগারো উপদেষ্টার কুঠুরি পার হলেন কিন্তু কারো কাছে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবটি শুনতে পারেননি। সবাই নিজের সাফল্যের কথা ও অন্যের ব্যর্থতার কথা আগে বলতে চায়।

শেষের কুঠুরিতে মিনমিনে ধরনের এক উপদেষ্টা বসে আছে। সে রাজাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। রাজা ধমক দিয়ে বললেন, এত কান্না কীসের? অন্য উপদেষ্টারা সমস্যা সমাধানের কথা না বলে শুধু নিজেদের নানান ভূমিকার কথা বলতে ব্যস্ত। এবার তুমি শুধু তোমার প্রস্তাবটা পেশ

করো। উপদেষ্টা হতাশ হয়ে বিস্ময়ে বলল, তারা তাদের ভূমিকার কথা আপনাকে বলে ফেলেছে আর আপনি তা শুনেও ফেলেছেন মহারাজ! তাহলে এবার আমারটা শুনুন–মহারাজ আমার বুদ্ধিতেই দাসী এত মূল্যবান পরামর্শটা দিয়েছে, অন্য কারো কথায় নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে কার কতটুকু ভূমিকা আর কৃতিত্ব তা আপনার বিবেচনা মহারাজ।

রাজা রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন দরবারে। রাজার নির্দেশে সকল উপদেষ্টাকে কুঠুরি থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো এবং সকল দাসীকেও ডাকা হলো।

রাজা বললেন, আমার উপদেষ্টাদের উপদেশ দিয়েছে কে?

সবাই মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। এক দাসী সভয়ে বলল, মহারাজ, আমরা হলাম দাসী। সারাদিন আপনাদের সেবার কাজে ব্যস্ত থাকি। তবে মাঝেমধ্যে ওই পিরুদাসীকে উপদেষ্টাদের সাথে কথা বলতে দেখতাম।

রাজা পিরুদাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি করে বলো, তুমি কি তাদের পরামর্শ দিয়েছ?

পিরুদাসীর প্রাণ যায় যায়। সে বার কয়েক ঢোক গিলে কোনোমতে বলল, আমি শুধু উপদেষ্টাদের জীবন বাঁচানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, জীবন বাঁচানোর জন্যে মানে?

দাসী সভয়ে বলল, মহারাজ, আপনি উপদেষ্টাদের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরামর্শ চেয়েছিলেন, তা ছিল তাদের জ্ঞানের অতীত। তারা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুভয়ে পালিয়ে দেশান্তরী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের এ জীবন-মরন সমস্যা দেখে আমি একটি প্রস্তাব দিয়েছি মাত্র।

রাজা দাসীকে বললেন, কী ছিল তোমার সেই প্রস্তাব, নির্ভয়ে বলো?

দাসী তার প্রস্তাবটি পেশ করল। প্রস্তাবটি শুনে সত্যি সত্যি মহা খুশি হয়ে গেলেন রাজা। আর বিলম্ব না করে রাজা পিরুদাসীকে উপদেষ্টা পদে আর বারো উপদেষ্টাকে রাজবাড়ির দাস পদে নিয়োগের আদেশ জারি করে দিলেন।

বাবার যত মানা

সাফওয়ানা রেজা অদ্রি

খেলাধুলা করবে না,
বেশি কথা বলবে না।
মোবাইল তুমি ধরবে না,
বেশি চিপস খাবে না।

আমার বাবার যত মানা,
কত কিছুই তো মানি না।
দেখবে ঠিকই মানব সব-ই,
ভুল কখনো করব না।

দয়া করে বাবা তুমি
মনটি খারাপ করো না।

তৃতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ধানমন্ডি শাখা

মীনার স্বভাব

মাহদি তানিম রেদওয়ান

মীনা যখন ছোট্ট ছিল
তার একটি স্বভাব ছিল
মীনা যখন বড়ো হলো
তার একটি স্বভাব ছিল
মীনার যখন বিয়ে হলো
তার একটি স্বভাব ছিল
মীনা যখন বুড়ি হলো
তার একটি স্বভাব ছিল
জানো কী, বলছ শোনো
সত্য বলার ধর্ম ছিল।

শ্রেণি নার্সারি, হলিলাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

ঘাসফড়িং, বুনোহাঁস ও ব্যাঙের গল্প

আহমেদ কিবরিয়া

অনেক দিন আগের কথা। সবুজে ঘেরা এক বন। সে বনে নানান ধরনের বন্যপ্রাণী বাস করত। সেখানে ছিল একটা ছোটো জলাশয়। ঐ জলাশয়ে একটা ব্যাঙ বাস করত। পাশে ছিল এক কাশবন। ঐ কাশবনের ঝোপে এক বুনোহাঁস বাস করত। কাশবনের একটা কাশগাছে আবার একটা ঘাসফড়িং বাস করত। ব্যাঙের সাথে ঘাসফড়িং ও বুনোহাঁসের খুব মিল ছিল। তারা সময় পেলেই গল্পে মজে উঠত।

একদিনের কথা, মোরগের কুক্কুরু কুক আর শেয়ালের হুক্কাহুয়া ডাকে ঘুম ভাঙল তাদের। প্রতিদিনের মতো তারা গল্পে মজে উঠল। ব্যাঙ বলল, ভাই খুব চিন্তায় পড়লাম। জলাশয়টা দেখেছ? কি অবস্থা! একদম পানি শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি কী করে বাঁচব বলো?

ঘাসফড়িং বলল, আসলে এই বন সুন্দর হলেও অনেক সমস্যা। তবুও এ বনে আমাদের আশ্রয় না হলে কী যে হতো?

বুনোহাঁস বলল, চিন্তা করো না। সামনেই বর্ষাকাল। জলাশয় পানিতে ভরে যাবে। তখন তো আর সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমরা তিনজন একসাথে আছি। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প আর আনন্দে দিনটা কাটালো। ব্যাঙ শাপলা ফুলের পাতায় লাফায় আর বুনোহাঁস পানিতে সাঁতার কাটে। ঘাসফড়িং খুশিতে তাদের সাথে উড়ে উড়ে চলছিল।

এভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। বর্ষাকাল চলে এল। জলাশয় পানিতে ভরে গেলো। নতুন ঘাস আর পাতায় বন ছেঁয়ে গেল। ব্যাঙের মন খুশিতে ভরপুর। তারা তিন বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল, এবার বনে তারা পিকনিকে খাবে ও ঘুরে বেড়াবে।

বুনোহাঁস বলল, মজার ব্যাপার! কিন্তু...।

এবার ঘাসফড়িং বলল, কিন্তু আবার কী! চলো নৌকা বানাই। পাতার নৌকা খুব মজার।

তারা তিন বন্ধু মিলে পাতা দিয়ে নৌকা বানালো। নৌকাটা খুব চমৎকার হলো। নৌকায় তিনজন চড়ে বসল। নৌকা চালাচ্ছিল ব্যাঙ। আর ঘাসফড়িং পিকনিকের খাবার তৈরি করছিল। বুনোহাঁস মিষ্টি গলায় গান ধরল।

হঠাৎ জোরে হাওয়া উঠল। নৌকা গেল উলটে।

ঘাসফড়িং পানিতে পড়ে গেল এবং বাতাসে দূরে ভেসে যেতে লাগল। ঘাসফড়িং চেঁচিয়ে বলতে লাগল, বাচাঁও বাঁচাও!

ব্যাঙ ও বুনোহাঁস সাঁতার জানত। ব্যাঙ বলল, চিন্তা করো না বন্ধু, আমরা তোমাকে বাঁচাবোই। ব্যাঙ ঘাসফড়িংকে টেনে নৌকায় তুলল।

এদিকে ঘাসফড়িঙের ডানা গেছে ভেঙে। সে ব্যথায় কাঁদতে লাগল। ওরা ঘাসফড়িংকে কাশবনে বুনোহাঁসের বাসায় নিয়ে এল। বুনোহাঁস লতাপাতা দিয়ে ঔষধ বানিয়ে ঘাসফড়িঙের ডানায় লাগিয়ে দিল। আর সাথে সাথে ওর ডানা জোঁড়া লাগল। ঘাসফড়িং ব্যাঙ ও বুনোহাঁসকে ধন্যবাদ জানালো।

এভাবেই ওরা সারাজীবন একে অন্যকে সাহায্য করেছে। ঐ বনে বাস করেছে সুখে-শান্তিতে।

শিক্ষা: একে অন্যকে সাহায্য করাই হলো প্রকৃত বন্ধুত্ব।

পাক পালালো বাঘের ভয়ে

দন্ত্যন ইসলাম

পঁচিশে মার্চ সেই কালরাত
বিভীষিকার শুরু,
পাক হানাদার অস্ত্র চালায়
বুকটা দুরু দুরু।

আচমকা আঘাত- জর্জরিত
রাতের ঢাকা শহর,
আগুন লাগায় মানুষ পোড়ায়
গড়ে রক্ত নহর।

সেই যে শুরু বর্বরতা
নয়টি মাসের যুদ্ধ,
কত মানুষ মারল পাকি
বাঙালিরা ক্ষুব্ধ।

সারা দেশেই হত্যা মিশন
হানাদারদের অস্ত্রে,
নারকীয় চিহ্ন ভাসে
অসহায়দের বস্ত্রে।

বাঙালি মন গর্জে চালায়
গেরিলা অভিযান,
স্বাধীন করতে দেশের মাটি
দেশেরই সম্মান।

একেক করে তিরিশ লক্ষ
প্রাণ যে গেল চলে,
মুক্তি তবু পায় না ভীতি
রক্তে আগুন জ্বলে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে
আসে কাঙ্ক্ষিত অর্জন,
লেজ গুটিয়ে পাক পালালো
শুনে বাঙালির গর্জন।

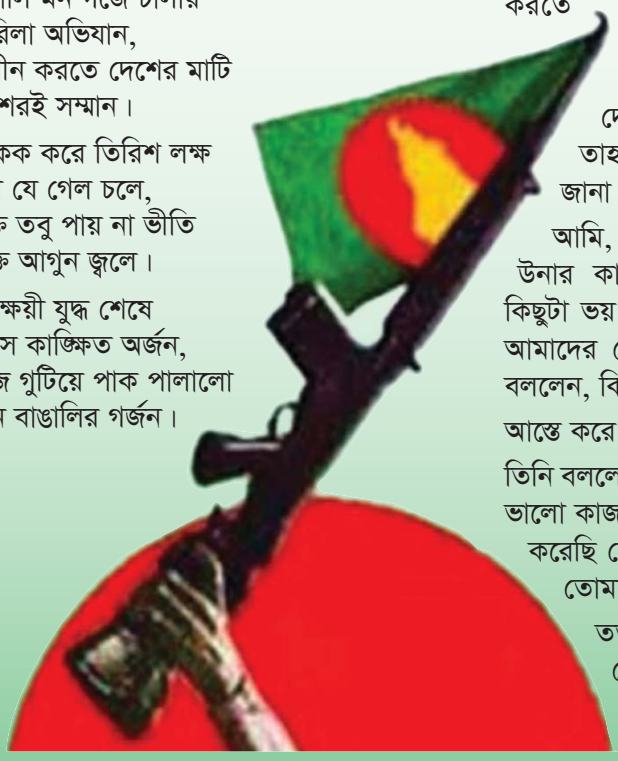

মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধ

মুহাম্মদ তারিক জামিল

আমি তখন খুব ছোটো। ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। পড়াশোনা আর খেলাধুলা ছাড়া অন্য কিছুতে তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে পাড়ার মুরুব্বিদের কাছ থেকে দারুণ সব গল্প শুনে নিতাম। আগেকার দিনের গল্প, রূপকথা আর স্মৃতিচারণ শুনতে বেশ আনন্দ পেতাম। নিজেকে তখন সেই যুগের একজন বলে কল্পনা করতাম।

একদিনের ঘটনা। স্কুল টিফিনের সময়, স্কুল মাঠের উত্তর কোণে আমতলায় দেখা মিলল একজন মুক্তিযোদ্ধার। নাম আব্দুল আজিজ। গ্রামের সবাই মুক্তিযোদ্ধা বলেই ডাকে। আমাদের গ্রামের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা তিনিই। স্কুলের পাশেই তার বাড়ি। স্কুল মাঠ থেকে দেখা যায় বাড়িটা। স্কুলের পেছনে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার ধানি জমি। মাঠে কাজ করতে করতে রৌদ্রতাপে কাতর হয়ে আমতলায় ছুটে এসেছেন। ক্লান্তিতে গাছের শেকড়ে গা এলিয়ে বসেছেন। আমরা উনাকে দেখে আনন্দে ছুটে গেলাম। যাক আজ তাহলে খুটে খুটে মুক্তিযুদ্ধের নানা বিষয় জানা যাবে।

আমি, রাসেল আর স্বপন তিনজন ছুটে গেলাম উনার কাছে। সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। কিছুটা ভয় ভয় লাগছে। মুক্তিযোদ্ধা বলে কথা। আমাদের দেখে তিনি কিছুটা নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, কি হে, হাবিব ভাইয়ের ছেলে না?

আস্তে করে বললাম, জ্বী চাচা।

তিনি বললেন, বসো বসো। তোমার আব্বা তো খুব ভালো কাজ করেছেন। আমরা লড়াই করে স্বাধীন করেছি দেশ। আর সেই দেশকে এগিয়ে নিতে তোমার আব্বা করেছেন বিদ্যালয়।

ততক্ষণে আমরা গাছের গোড়ায় বসে গেলাম। যেহেতু আম্মু এ স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তাই জানতে চাইলেন, আম্মু

স্কুলে এসেছেন কিনা। পড়াশোনা কেমন চলছে। আব্বু কেমন আছেন ইত্যাদি।

আমি ঠিক ঠিক জবাব দিলাম। এবার তিনি বললেন, তোমরা টিফিন খাওয়া রেখে আমার কাছে ছুটে এলে যে?

আমি বললাম, চাচা আপনি আমাদের এলাকার এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কি না মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমরা আপনার মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি আমাদের নিজ কানে শুনব।

মুক্তিযুদ্ধ কথাটা শুনেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বলতে শুরু করলেন স্বচক্ষে দেখা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর করুণ কাহিনি।

তিনি বলেন, 'আমি তখন নবম শ্রেণিতে পড়ি। মফস্বলের একটি স্কুলে। প্রতিদিন স্কুলে যাই। পড়াশোনা আর খেলাধুলায় মেতে থাকি। সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত আমার মাঝে ছিল না। শহুরে জীবনের কোনো প্রভাব গ্রামীণ জনপদে ছিল না। একদিন ক্লাসে স্যার বললেন, দেশের পরিস্থিতি বেশি ভালো না। ঢাকায় নাকি অনেক মারামারি হয়েছে। অনেক মানুষ মেরে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি তখন পর্যন্ত শেখ সাবকে চিনতাম না।'

'এরপর একদিন শুনলাম, আমাদের গ্রামেও মিলিটারি চক্কর লাগিয়ে গেছে। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বেশ ক'জন নেতাকে ধরে নিয়ে গেছে। এদের কোনো খোঁজখবরও পাওয়া যাচ্ছে না। মাঠেঘাটে সবখানে আতঙ্ক। খেলার মাঠে কেউ খেলতে আসে না। স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলে নাকি রাজাকার আর মিলিটারি মিলে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। গভীর রাতে যখন মানুষ গভীর নিদ্রায় ডুবে যেত, তখন ক্যাম্প থেকে নির্যাতিত মানুষের গোঙানির শব্দ ভেসে আসত। আমরা স্পষ্ট সে শব্দ শুনতে পেতাম। কিন্তু তাদের উদ্ধার করার মতো সামর্থ্য আমাদের ছিল না।

একদিন অনেক গোপনে পাটক্ষেতের ভেতরে, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক ভাই আমাদের নিয়ে মিটিং করলেন। জ্বালাময়ী ভাষায় দেশের জন্য কিছু একটা করার আহবান জানালেন। বললেন, মজলুম মানুষের গোঙানির শব্দে আজ ঘুমাতে পারি না। বোনের অপমান আর সহ্য করতে পারছি না। এখন সময় লড়াই করার। মরতে যদি হয় তাহলে লড়াই করেই মরব।'

চাচা যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন ওনাকে অনেক চেতনাময়ী মনে হচ্ছিল। মুষ্ঠিবদ্ধ হাতদ্বয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। আমরাও চেতনাময়ী ভাব অনুভব করছিলাম।

এরপর তিনি বলেন, 'ঐ বৈঠকেই আমরা ষোলো জন যুদ্ধে যাবার নাম লিখিয়ে ছিলাম। কিন্তু পারিবারিক চাপের মুখে পাঁচ জন শেষতক যেতে পারেনি। আমরা এগারো জন নানা ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে অংশ নিতে পেরেছিলাম। তবে মজার বিষয় ছিল আমার মা আমাকে নিজ হাতে যুদ্ধে যাবার ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছিল। আর যাবার সময় একমুঠো টাকা হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিল প্রাণপণ লড়াই করবে, বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার সূর্যালোকে দেখা হবে আর মরে গেলে দেখা হবে জান্নাতে, মায়ের কথাটুকু এখনো কানে ধ্বনিত হয়।

এরই মাঝে টিফিনের সময় শেষ হয়ে ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। মুক্তিযোদ্ধা আজিজ চাচাকে বললাম, চাচা আজ যাই। বাকিটুকু অন্যদিন শুনব। তো যাওয়ার আগে চাচা একটি উপদেশ দিলেন। সেটা ছিল এরকম, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যেমন লড়াই করেছি স্বাধীনতার জন্যে, ঠিক সে সময় একদল লোক চেয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিতে। এরাও কিন্তু এ দেশের। কিন্তু চিন্তা চেতনায় ছিল ভিনদেশি। এরা ও এদের চেলারা এখনো কিন্তু ঘাপটি মেরে আছে আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে। তাই তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রুখে দিতে হবে ওদের সব ষড়যন্ত্র'।

মুক্তিযোদ্ধা আজিজ চাচার কথাগুলো মনে গেঁথে নিলাম আমরা। এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরাও আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমরা যে নতুন দিনের মুক্তিযোদ্ধা।

এটা একটা বাস্তবসম্মত ঘটনা। যা শৈশবে আজিজ চাচার মুখ থেকে নিজ কানে শুনেছিলাম। উনার নাম: মো: আব্দুল আজিজ, পিতার নাম : মৃত ইন্তাজ আলী মুন্সী, গ্রাম: হালিউড়া, পো: কিসমত বনগ্রাম, থানা : নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহ। ভারতের আসাম থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ১১নং সেক্টরে।

তথ্যসূত্র : বেসামরিক গেজেট ২৯৬৯ তারিখ ১৪-০৫-২০০৫, গেজেট নং ২৫৪২।

আলিম ২য় বর্ষ, কাদিরাবাদ আলিম মাদ্রাসা, খারুয়া, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

গনি হঠাৎ গুড্ডু

মিনহাজ ফয়সল

পড়ার সময় ঘুমে ডাকে ঘুমের সময় টিভি
খালা-ফুফু আন্টি হলেন দাদি ছিলেন বিবি।
খাবার সময় খেলা চলে খেলার সময় পড়া
গনি হঠাৎ গুড্ডু হলো তেলেসমাতি গড়া।
ক্লাসে বসে ঘরের খবর মায়ের সাথে চ্যাটে
টিফিন হলে যাওয়ার কথা করতে খেলা মাঠে!
চার দেয়ালে বন্দি ঘরে বাহির হলে গাড়ি
বাসায় থেকে ভুলেই গেছি গায়ের ছোট্ট বাড়ি!
নিজের দেশের রূপের কথা বইয়ে পড়েই জানে,
ভোর-বিহানের পাখির ধ্বনি খুব শুনেনি কানে!
বাংলা হলো মাতৃভাষা সহজ করে শিখে
ইংরেজিতে কথা বলে পরীক্ষাতে লিখে!
রুটিন করে আলো দেখা ছুটির দিনে পার্কে
সুযোগ পেলে গায়ের শিশু ধরতে পারে আর কে।
যন্ত্র শিশু মন্ত্র পড়ে হচ্ছে বড়ো ঠিকই
ইচ্ছে করে মুক্ত শিশুর বর্ণনা রোজ লিখি।

নবারুণ স্কুল প্রতিনিধি

ইন্তিসার ইমরান (রাইসা)
চতুর্থ শ্রেণি
মালেকা একাডেমি, গোপালগঞ্জ

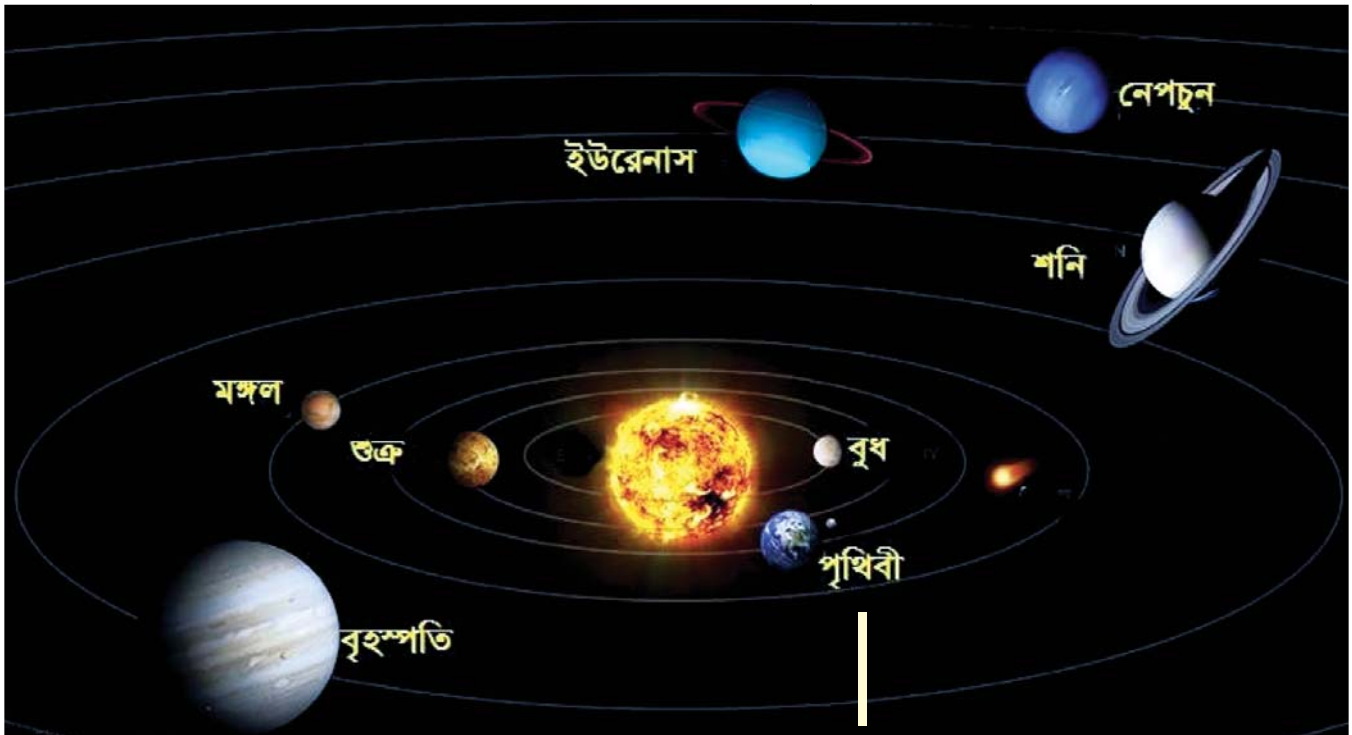

আকাশে গৌরি দীপশিখা
সূর্য ও তার গ্রহরা

সানাউল্লাহ আল-মুবীন

পৃথিবীরে চাহে সে যখন –
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্বর করিবারে,
জীবন করিতে প্রবাহিত
কুসুম করিতে বিকশিত।
[রবীন্দ্রনাথ]

সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন আমরা চোখ মেলে বাইরে তাকাই, দেখতে পাই, পৃথিবী আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, গাছে-গাছে পাখি ডাকছে, রঙিন পাখা মেলে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, বাগান আলো করে ফুটে আছে গোলাপ-চন্দ্রমল্লিকা-ডালিয়া। পৃথিবীতে এই যে জীবনের প্রবাহ, রঙের সমারোহ – কীভাবে সম্ভব হয়েছে এই সবকিছু? বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীতে এই যে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে – পাখি গান গাইছে, গাছে-গাছে ফুল ফুটছে, নদীতে মাছেরা নৃত্য করছে – এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে দূর আকাশে জ্বলজ্বল করা একটি তারার কল্যাণে। তারাটির নাম সূর্য। এটি আমাদের একান্ত আপন তারা। এর বুকের গভীরে পরমাণু পুড়ে তৈরি হচ্ছে আলো ও তাপ। তার শক্তিতে প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরের একটি গ্রহ – পৃথিবীতে বয়ে চলেছে প্রাণের জোয়ার। আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস এই সূর্য। এটি আকাশে অমন দাউদাউ করে না জ্বললে নিভে যেত পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ।

সূর্য সৌরজগতের রাজা। এক অফুরান শক্তির আধার এটি। সৌরজগতের মোট বস্তু ভাণ্ডারের নিরানব্বই ভাগেরও বেশি রয়েছে এর বুকে। পৃথিবীর চেয়ে তিন লাখ ত্রিশ হাজার গুণেরও বেশি ভারী এটি। এই ভর তার পরিবারের অন্য সব সদস্য – আটটি গ্রহ, তাদের প্রায় পৌনে দুশো উপগ্রহ, প্লুটোর মতো কয়েকটি বেটে গ্রহ, কোটি কোটি গ্রহাণু, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদির মিলিত ভরের ন'শো গুণেরও বেশি। এর গভীরে রয়েছে এক অতি উত্তপ্ত পরমাণু চুলা। সারাক্ষণ জ্বলছে সেটি। প্রতি সেকেন্ডে তাতে প্রায় ষাট কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস পুড়ছে, তৈরি

হচ্ছে হিলিয়াম নামের অন্য একটি গ্যাস, বেরিয়ে আসছে আলোর কণা, তাপের ঝলক। এর মোট বিকীর্ণ শক্তির কণামাত্র – প্রায় দু-শো কোটি ভাগের একভাগ – নিয়ে টিকে আছে পৃথিবীর জীবজগৎ।

কিন্তু এত আলো, এত শক্তি পায় কোথায় সূর্য? এত অপব্যয় কী করে সে করে? বিজ্ঞানীরা বলেন, আলো সৃষ্টি হয় তার বুকের ভেতরকার পরমাণু চুলায়। সেই চুলায় অত্যন্ত উচ্চতাপে হাইড্রোজেনের পরমাণু পুড়ে তৈরি হচ্ছে হিলিয়াম। একটি হিলিয়াম পরমাণুর গঠনে দরকার হয় চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর। কিন্তু একটি হিলিয়াম পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান ভারী নয়। সেক্ষেত্রে সামান্য ভর হারিয়ে যাচ্ছে। সেই হারানো ভরটুকুই বেরিয়ে আসছে জ্যোতিষ্কণা হয়ে। আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বে দেখিয়েছেন, অতি সামান্য ভর ধ্বংস করে পাওয়া যেতে পারে কী বিপুল শক্তি। সূর্যের শরীরে হাইড্রোজেনের যে বিশাল সঞ্চয় আছে, তাতে আরো শত শত কোটি বছর এভাবে উদ্দাম অপব্যয় চালিয়ে যেতে পারবে।

সূর্যের আলো সৃষ্টি হয় তার কেন্দ্রের পরমাণু চুল্লিতে। সেই আলো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার ঘন গ্যাসের বাধা ঠেলে ভেসে ওঠে আলোকমণ্ডলে, তারপর বর্ণমণ্ডল ও মুকুটমণ্ডল পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে শূন্যে। যে আলো সূর্যের কেন্দ্র থেকে তার উপরিতলে আসতে কাটিয়ে দেয় লাখ লাখ বছর। মহাশূন্যের বিশাল এলাকা ডিঙিয়ে পৃথিবীতে আসে মাত্র আট মিনিটে। তার মোট বিকীর্ণ আলোর একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের কাজে লাগে। অবশিষ্ট আলো কোথায় যায়, দুনিয়ার কোন কাজে লাগে?

সকাল বা সন্ধ্যায় সূর্য যখন থাকে দিগন্ত রেখার কাছে, আলো থাকে যথেষ্ট কোমল, কখনো কখনো এর লাল শরীরে দেখা যায় বিন্দু বিন্দু ছায়া। এগুলো সূর্যের চৌম্বক ঝড়ের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা এলাকা। আমরা বলি সৌরদাগ বা কলঙ্ক। এগুলোর কোনোটা চওড়ায় হতে পারে মাত্র কয়েকশ কিলোমিটার, কোনোটা হাজার হাজার কিলোমিটার। সূর্যদেহের একটি বড়োসড়ো কলঙ্কের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারবে বেশ কয়েকটা পৃথিবী। এসব বড়ো কলঙ্কের থাকে একটি অপেক্ষাকৃত গাঢ় কেন্দ্র। একে বলে প্রচ্ছায়া। প্রচ্ছায়াকে ঘিরে থাকা বাইরের হালকা ছায়াকে বলে উপচ্ছায়া। এসব কলঙ্কের কোনোটা টিকে থাকে মাত্র ঘণ্টাখানেক, কোনোটা মাসের পর মাস। বিজ্ঞানীরা গুণে দেখেছেন, এসব কালো ছায়া গায়ে নিয়ে সূর্যটা নিজের ওপর ঘুরছে, পৃথিবী যেমন তার মেরুদণ্ডের ওপর ঘোরে। নিজের ওপর পৃথিবী ঘোরে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার, সূর্য পঁচিশ দিনে।

পৃথিবীর আবহাওয়ায় নানা উলটপালট হয়। এখানে হাওয়া বয়, মেঘ জমে, বৃষ্টি নামে, কখনো ওঠে ঝড়, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়, বয়ে চলে স্রোত, নদী কল্লোলিত হয়, ক্ষেতে ফসল ফলে, গাছে ধরে ফল। এই সবেরই চাবিকাঠি রয়েছে দূর আকাশে: সূর্যের হাতে। এমন কী, তোমার টবে ফোটা লাল গোলাপের পাপড়ি কিংবা প্রজাপতির পাখার বাহারি রংটিও আসে সূর্য থেকে। বছরের পালায় সূর্যে কলঙ্কের সংখ্যা বাড়ছে, কমছে। তার ঢেউ এসে লাগছে পৃথিবীর পরিবেশে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *বিশ্বপরিচয়* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বনের বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়িতে আঁকা পড়ে সূর্যের গায়ের এসব কালো দাগের ছাপ। যে বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা থাকে যত বেশি, সে বছর নাকি বনস্পতির গুঁড়িতে আঁকা কালো দাগের চওড়াও হয় তত বড়ো। তিনি তাঁর *শেষ সপ্তকের* একটি কবিতায়ও চমৎকার ধরেছেন বিষয়টি:

বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ওই তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।

আকাশে তারারা আছে একক, জোড়া, ত্রয়ী ইত্যাদি ব্যবস্থায়। অবশ্য হাজার হাজার সদস্য নিয়েও গড়ে উঠতে পারে কোনো কোনো তারা-ব্যবস্থা। সূর্য একটি একক তারা, এর কোনো সঙ্গীসাথি নেই; তবে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রহদল। এই দলে রয়েছে আটটি সদস্য: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। এসব গ্রহের আবার রয়েছে উপগ্রহ। সূর্যের পরিবারে এছাড়া আছে প্লুটো, কেরোন ইত্যাদি কয়েকটি বেঁটে গ্রহ, কোটি-কোটি গ্রহাণু ও ধূমকেতু। এসব আকাশবস্তু ঘুরছে নিজ নিজ কক্ষপথে। আমরা এ পর্যায়ে সূর্যের গ্রহদল সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর করব:

বুধ

সূর্যের প্রথম গ্রহ বুধ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ছয় কোটি কিলোমিটার। এটি সূর্যের সবচেয়ে ছোটো গ্রহ। এর আকার পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। অর্থাৎ আড়াইটি বুধগ্রহ এক সঙ্গে করলে তা পৃথিবীর সমান হবে।

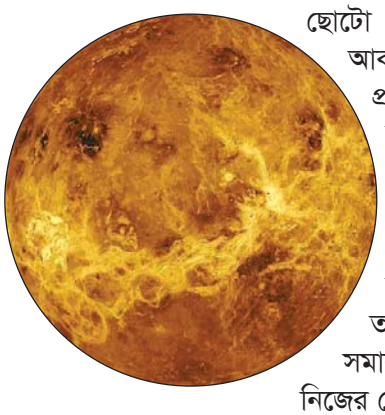

নিজের মেরুদণ্ডের ওপর গ্রহটি একবার পাক খায় পৃথিবীর হিসাবে প্রায় উনষাট দিনে, আটাশি দিনে একবার ঘুরে আসে সূর্যের চারপাশ। কিন্তু মেরুদণ্ডের ওপর একবার পাক খেলে তার একদিন হয় না। একটি দিন পূর্ণ করতে মেরুদণ্ডের ওপর তাকে দিতে হয় তিন-তিনটি পাক। ওই সময়ে সূর্যের চারপাশে সে ঘুরে আসে দুবার। অর্থাৎ বুধের আকাশে সূর্য চলে খুবই ধীর গতিতে। একটি দিনের মধ্যে কেটে যায় তার দু-দুটো বছর।

আরও একটি মজার ব্যাপার ঘটে বুধের দেশে। সেখানে প্রথমে সূর্য ওঠে পুবদিকে। তারপর আকাশে কিছুক্ষণ থাকার পর ডুবে যায় পুবদিকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সূর্যোদয় হয়। তারপর পুরো একটি বছর আকাশে থেকে, সকাল-দুপুর-বিকেল কাটিয়ে, অস্ত যায় পশ্চিম দিকে। কিছুক্ষণ পর সূর্য আবার ওঠে, পশ্চিম দিকে। তারপর আবার অস্ত যায় পশ্চিম দিকে। এবার পুরো একটি বছর ধরে রাতের আঁধার। অর্থাৎ, বুধের একটি দিন পৃথিবীর একশ ছিয়াত্তর দিনের সমান। সেখানে একদিনে দুপুর হয় একবার। মধ্যরাতও আসে একবার। কিন্তু সূর্যোদয় হয় তিনবার। দুবার পুবদিকে, একবার পশ্চিম দিকে। সূর্য ডুবেও তিনবার। দুবার পশ্চিম দিকে, একবার পুবদিকে।

বুধের ইউরোপীয় নাম মারকারি। রোমান দেবতা মারকারির নামে এই নাম। সূর্যের সবচেয়ে চঞ্চল গ্রহ এটি। কক্ষপথে সে উড়ে চলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে। বৃত্তের তুলনায় বেশ লম্বাটে এর কক্ষপথ। এর কোনো উপগ্রহ নেই।

বুধের দেশ কিছুটা আমাদের চাঁদের দেশের মতো। চাঁদের মতো সেখানে আছে অসংখ্য গর্ত, গভীর খাদ, উঁচু পাহাড়, বিশাল ছড়ানো সমতল ভূমি। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হওয়ায় এর তাপমাত্রা খুব বেশি। দিনের বেলায় সেখানে তাপমাত্রা ওঠে চারশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। এই তাপে সিসে গলে যেতে পারে। এতে বাতাসের অণু এত বেশি অস্থির হয়ে উঠবে যে, গ্রহটি তাদের আর আটকে রাখতে পারবে না, তারা শূন্যে ছুটে পালাবে। সুতরাং এটি একটি মরা দেশ। এমন মরা দেশে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়।

শুক্র

সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র। আকারের দিক থেকে এটি সৌরজগতের তৃতীয় ছোটো গ্রহ। এর ইউরোপীয় নাম ভিনাস। রোমান সৌন্দর্যের দেবি ভিনাসের নামে এই নাম। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় এগারো কোটি কিলোমিটার। আকারে ও ভরে এটি পৃথিবীর প্রায় সমান। এর ব্যাস বারো হাজার কিলোমিটারের কিছু বেশি, পৃথিবীর পঁচানব্বই শতাংশ। ভর বিরাশি শতাংশ। একে চারপাশে চাদরের মতো ঘিরে রয়েছে বহু কিলোমিটার পুরু কার্বন ডাই-অক্সাইডের শাদা মেঘ।

এতে আকাশ থেকে অনবরত ঝরে পড়ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের বৃষ্টি। এটি নিজ অক্ষের ওপর একবার পাক খায় পৃথিবীর হিসাবে দু-শো তেতাল্লিশ দিনে। সৌরজগতের স্বাভাবিক নিয়মের উলটো, অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে। আর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসে দু-শো পঁচিশ দিনে। অর্থাৎ এর বছর দিনের চেয়ে কিছুটা ছোটো। একটি প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সেকেন্ডে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বেগে গ্রহটি উড়ে চলেছে। বুধের মতো এরও নেই কোনো উপগ্রহ।

শুক্রগ্রহ 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' নামেও পরিচিত। ভোররাতে পুব-আকাশে উঠলে একে বলে শুকতারা, সাঁঝ আকাশে পশ্চিম দিকে উঠলে বলে সন্ধ্যাতারা। প্রতি এক বছর সাত মাস পর পর এটি পৃথিবীর চার কোটি কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে চলে আসে। এই সময়ের কাছাকাছি এটি সূর্য ওঠার আগে পূব-আকাশের এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে ওঠে, অবশ্য তখন যদি আকাশে চাঁদ না থাকে। একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একে সম্বোধন করে চমৎকার এক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন:

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে।

সূর্য ও চাঁদের পরে শুক্র পৃথিবীর আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একে পৃথিবীর বোন বলে ভেবে এসেছে। এটি যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসে, দিনের বেলায়ও একে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য আকাশের ঠিক কোনখানে এর অবস্থান সেটা জেনেই তাকাতে হবে।

শুক্রগ্রহের মাটিতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। কারণ প্রাণ বিকশিত হওয়ার মতো পরিবেশ সেখানে গড়ে উঠেনি। তার বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস; আর দিনের বেলা সেখানে তাপমাত্রা ওঠে প্রায় পাঁচশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর চেয়ে নব্বই গুণ বেশি, যা সমুদ্রের এক কিলোমিটার নিচের পানির চাপের সমান। প্রাণ বিকাশের পক্ষে এমন পরিবেশ মোটেও সহায়ক নয়।

পৃথিবী

সূর্যের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবী। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার। প্রতি তেইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিটে এটি নিজ অক্ষের ওপর একবার পাক খায়, পশ্চিম থেকে পুবে, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে। কক্ষপথে এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার। সূর্যের ছোটো গ্রহগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়ো। এর ব্যাস তেরো হাজার কিলোমিটারের কাছাকাছি। এর একটি উপগ্রহ রয়েছে: চাঁদ। প্রায় আটাশ দিনে এটি একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবী আমাদের আবাসস্থল, আমাদের মহাজাগতিক ঠিকানা। এখন পর্যন্ত, আমাদের জানামতে, মহাবিশ্বের এটিই একমাত্র স্থান, যা মুখর হয়েছে প্রাণের কলতানে। জড়বস্তু এখানে বিবর্তিত হয়েছে চেতনায়।

মঙ্গল

সূর্যের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় তেইশ কোটি কিলোমিটার। শুক্রগ্রহের পরে এটিই পৃথিবীর কাছের গ্রহ। এটি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে, তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব নেমে আসে ছয় কোটি কিলোমিটারের মধ্যে। তখন সূর্য, চাঁদ ও শুক্রগ্রহের পরে এটিই হয়ে ওঠে আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

মঙ্গলগ্রহের ইউরোপীয় নাম মার্স। রোমান যুদ্ধদেবতা মার্সের নামে এই নাম। সৌরজগতের দ্বিতীয় ছোটো গ্রহ এটি। এর আকার পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। নিজের অক্ষের ওপর একবার ঘুরতে এর লাগে চব্বিশ ঘণ্টা সাঁইত্রিশ মিনিট, পৃথিবীর চেয়ে আধা ঘণ্টার একটু বেশি। তাই মঙ্গলের দিনরাত আমাদের দিনরাতের চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে পৃথিবীর ছশো সাতাশি দিনে। এর কক্ষপথ অনেকটা ডিমের মতো। কক্ষপথে এর উড়ালবেগ সেকেন্ডে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার। ফোবোস ও ডিমোস নামে এর ছোট্টো দুটো উপগ্রহ আছে।

মঙ্গলগ্রহ সূর্য থেকে দূরে আছে পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দেড়গুণ। এ কারণে এর পরিবেশ যথেষ্ট ঠান্ডা। প্রায় সারা বছরই তাপমাত্রা থাকে বরফ জমার নিচে। শুধু গ্রীষ্মের দুপুরে কিছুটা ওপরে ওঠে, তা-ও বিষুব প্রদেশে। এর একটি পাতলা বায়ুমণ্ডল আছে, তার প্রধান উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড। এছাড়া আছে কিছু নাইট্রোজেন, আরগন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও সামান্য জলীয় বাষ্প।

মঙ্গলকে নিয়ে মানুষের কৌতূহল দীর্ঘদিনের। আগেকার দিনের বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, এই গ্রহে মানুষ কিংবা এমনই কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। সেখানে তারা সভ্যতা গড়ে তুলেছে। গত শতকের সত্তর ও নব্বইয়ের দশকে মঙ্গলের দেশে গ্রহযান পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, সেখানে আদৌ কোনো সভ্যতা গড়ে উঠেনি। তবে, প্রাণ বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরা নাকচ করে দেননি।

বৃহস্পতি

সূর্যের পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতি। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ। এর ইংরেজি নাম জুপিটার। জুপিটার রোমানদের প্রধান দেবতা। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় আশি কোটি কিলোমিটার। এই গ্রহ তার বিশাল বপু নিয়ে নিজ অক্ষের ওপর একবার পাক খায় দশ ঘণ্টারও কম সময়ে। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তেরো কিলোমিটার বেগে ছুটে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে প্রায় বারো বছর। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে গঠিত গ্রহটির উপরিতল বেশ তরল, এমনকী পানির চেয়েও।

পাঁচ ডজনেরও বেশি সংখ্যক উপগ্রহ ঘুরছে এর চারপাশে। এদের মধ্যে চারটি উপগ্রহ খুবই বড়ো। একটির নাম গানিমিদ। এটি সৌর জগতের সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ। আকারে এটি বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো।

বৃহস্পতির গায়ে রয়েছে বিশাল এক লাল দাগ। ভয়েজার নভোযানের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, এটি আসলে প্রচণ্ড এক ঝড়ের এলাকা। এই ঝড়ো এলাকা এতই বিশাল যে, এর ভেতর অনায়াসে ঢুকে যেতে পারবে বেশ কয়েকটি পৃথিবী। ভয়েজার আরো জানিয়েছে, বৃহস্পতির রয়েছে প্রায় আট হাজার কিলোমিটার চওড়া ও তিরিশ কিলোমিটার পুরু এক বলয়, যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে গ্রহটিকে বেষ্টন করে আছে।

বৃহস্পতিকে বলা হয় গ্রহদের রাজা। এটি এমন এক দানব গ্রহ যে, এর পেটের ভেতর পুরে রাখা যাবে প্রায় এক হাজার তিনশ পৃথিবী। সৌরজগতের অন্য সব গ্রহের ভর একসঙ্গে করলে যা দাঁড়াবে, বৃহস্পতির একার ভর তার প্রায় আড়াই গুণ। আর কয়েক গুণ ভর জোগাড় করতে পারলে এটি হয়ত হয়ে উঠত একটি ছোটোখাটো তারা। তখন আমরা হয়ত বাস করতাম একটি দুই সূর্যওয়ালা গ্রহে। আকাশে উঠত দুটো সূর্য, কখনো নামত না রাত।

শনি

বৃহস্পতির পরের গ্রহ হচ্ছে শনি। এটি সূর্যের ষষ্ঠ গ্রহ। এর ইংরেজি নাম স্যাটার্ন। দেবতা জুপিটারের পিতা স্যাটার্ন-এর নামে এই নাম। সৌরজগতের দ্বিতীয় বড়ো গ্রহ এটি। পৃথিবীর চেয়ে প্রায় সাড়ে-সাতশ গুণ বড়ো এটি। এই গ্রহ সূর্য থেকে দূরে আছে প্রায় দেড়শ কোটি কিলোমিটার। এটি প্রায় সোয়া দশ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষের ওপর পাক খায়, আর পৃথিবীর হিসাবে প্রায় তিরিশ বছরে সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসে। কক্ষপথে এর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় দশ কিলোমিটার। এর গড় ঘনত্ব পানির চেয়েও কম। একে নিয়ে গিয়ে যদি বিশাল কোনো অথই পাথারে ফেলা সম্ভব হয়, তবে এটি ভেসে থাকবে বলের মতো।

শনি এক রুপবান গ্রহ। ছবিতে দেখা যায়, একে ঘিরে আছে অপরূপ সুন্দর এক বলয় ব্যবস্থা। আগে জানা ছিল এর সংখ্যা তিন। কিন্তু ভয়েজার নভোযানের পাঠানো ছবি থেকে দেখা যায়, শনির বলয় কেবল তিনটি নয়, সংখ্যায় এরা লাখ লাখ। এসব বলয় তৈরি ছোটো ছোটো নুড়ি থেকে শুরু করে কয়েক টন ওজনের পাথরখণ্ড দিয়ে। আর এরা উপগ্রহের মতো

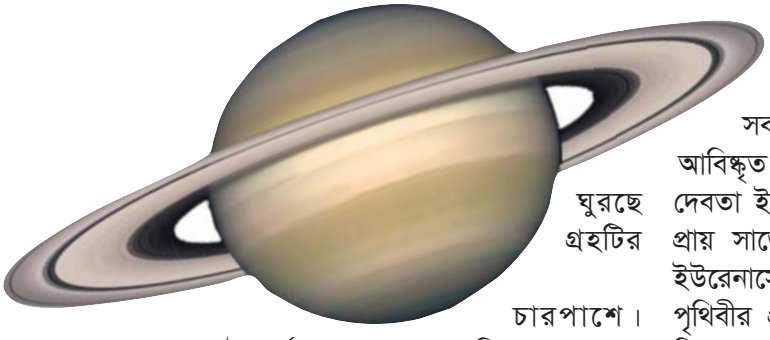

ঘুরছে গ্রহটির চারপাশে। এর সৌন্দর্যে অভিভূত একজন বিজ্ঞানী একে অভিহিত করেছেন সৌরজগতের রত্ন বলে।

এখন পর্যন্ত শনির প্রায় পাঁচ ডজন উপগ্রহের কথা জানা গেছে। এর সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহটির নাম টাইটান। এটি সৌরজগতের দ্বিতীয় বড়ো উপগ্রহ; বৃহস্পতির চেয়ে এটি কিছুটা ছোটো, বুধগ্রহের চেয়ে সামান্য বড়ো। সৌরজগতের এটিই একমাত্র উপগ্রহ, যেখানে একটি ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে।

ইউরেনাস

ইউরেনাস সূর্যের সপ্তম গ্রহ। এটি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় সত্তর গুণ বড়ো। কক্ষপথে সৌরজগতের সবচেয়ে হেলে থাকা গ্রহ এটি। প্রায় আটানব্বই ডিগ্রি হেলে আছে গ্রহটি। ফলে অক্ষের ওপর এটি খাড়াভাবে ঘুরতে পারে না, ঘুরে প্রায় শোয়া অবস্থায়। ষোলো ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে এটি নিজের ওপর একবার পাক খায়, অন্য গ্রহগুলোর উলটো, অর্থাৎ পূব থেকে পশ্চিমে। কক্ষপথে এর উড়ে চলার বেগ সেকেন্ডে প্রায় সাত কিলোমিটার। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে গ্রহটির লেগে যায় প্রায় চুরাশি বছর। দুই ডজনেরও বেশি উপগ্রহ ঘুরছে একে ঘিরে। বৃহস্পতি ও শনির মতো এরও রয়েছে বলয়ব্যবস্থা।

নেপচুন

সূর্যের অষ্টম গ্রহ নেপচুন। এটি সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ। ১৮৪৬ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। এর নাম রাখা হয় রোমান সমুদ্র দেবতা ইউরেনাসের নামে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে চারশ কোটি কিলোমিটার। আকারে ইউরেনাসের চেয়ে এটি কিছুটা ছোটো, এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় ষাট গুণ। গ্রহটি প্রায় বিশ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের ওপর একবার পাক খায়। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে পৃথিবীর হিসাবে প্রায় একশ পঁয়ষট্টি বছর। এটি সূর্যের সবচেয়ে ধীরগামী গ্রহ। কক্ষপথে এর বেগ সেকেন্ডে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। এর উপগ্রহ সংখ্যা এক ডজনের বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য আরও অন্তত পাঁচশ কোটি বছর আলো দিয়ে যাবে পৃথিবীকে এবং তার অন্য গ্রহগুলোকে, তারপর একদিন ফুরিয়ে আসবে তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্বালানি, বুড়ো হয়ে আসবে সে। মরে যাওয়ার আগে সে হয়ে উঠবে একটি অতি বিস্ফোরিত লাল দানব তারা। দারুণ ফুলে-ফেঁপে উঠবে তার শরীর। সৌরজগতের ভেতরের অংশ চলে যাবে তার পেটের ভেতর। এর বহু আগেই শূন্যে উড়ে যাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, উবে যাবে সমুদ্রসমূহ। পৃথিবী মরে গিয়ে পরিণত হবে এক উত্তপ্ত নরকে। একসময় নিভে যাবে সূর্যের পরমাণু চুলা। সে তখন হয়ে উঠবে একটি অতি ঘন, কালো বেঁটে তারা তার বুকে আর তখন আলোর সৃষ্টি হবে না। অর্থাৎ সূর্য সেদিন পুরোপুরি এক মরা তারা। তার হিমায়িত শবের চারপাশে আজকের মতো সেদিনও হয়ত ঘুরতে থাকবে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবী, এবং সম্ভবত তার অন্য গ্রহরাও।

রহস্য গল্প

রহস্যময় বুড়ো

অবনিল আহমেদ

ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে দরজা লক করে বেরিয়ে পড়লেন ফারুক সাহেব। ৩০ মিনিট বাদে এসে দেখেন, বাসার দরজা খোলা।

তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে দেখেন ঘর থেকে ২ লাখ টাকার গয়না ও ৪ লাখ টাকা ক্যাশ উধাও। তখনই ফারুক সাহেব পুলিশকে ফোন করলেন এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে হাজির হলো গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মাহবুব মরশেদ। সাথে নিয়ে এল আরেক জনকে।

ফারুক সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ও কে?

মরশেদ বললেন, ও হলো বিশেষ গোয়েন্দা, ওর নাম সাম্য।

তারপরই তদন্ত শুরু করল ওরা। বাড়ির লোক আর বুয়া বাদে আর কারো ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই। সাম্য জিজ্ঞেস করল, বুয়া কোথায়?

ফারুক বললেন, সে নিচতলায়ও কাজ করে । কাজ শেষ করে আসবে।

তারপর ওরা বুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু তাতে কিছু পেল না।

আবার ঘটনাস্থলে এসে সাম্য দেখল আলমারির সামনে কিছু মাটি পড়ে আছে। তার মধ্যে একটি জুতোর ছাপ স্পষ্ট। তখনি সাম্য ওই জুতোর ছাপের সঙ্গে বাড়ির সবার জুতো মিলিয়ে দেখল। এক জোড়া জুতোর সঙ্গে তা মিলে গেল।

জুতো টা ছিল একটি খোঁড়া বুড়োর। সারাদিন হুইলচেয়ারে বসে থাকে। নতুন ভাড়াটিয়া সে।

সাম্য যখনি তাকে জুতো ফেরত দিতে গেল তখনি সাম্যর চোখে পড়ল যে তার জুতোয় ভাঁজ আছে। তখন সাম্য জিজ্ঞেস করল, আপনি হাঁটতে পারেন না কতদিন হলো?

বুড়ো বলল, প্রায় ৫ বছর।

সাম্য বলল, এই জুতো জোড়া কিনেছেন কতদিন হলো, সে বলল ৪ মাস।

সাম্য বলল, তাহলে অপনার জুতোয় ভাঁজ এল কী করে?

তখনই থতমত খেয়ে গেল সে। সাথে সাথে সাম্য তার গোঁফ ধরে টান মারল, গোঁফ সাম্যর হাতে চলে আসল।

এরপর বুড়ো অপরাধ স্বীকার করল। ফারুক সাহেব জিনিস ফিরে পেয়ে কেঁদেই দিলেন, আসলেই সাম্য ছাড়া এটা অসম্ভব ছিল।

নবম শ্রেণি, রূপনগর সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

মজার গল্প

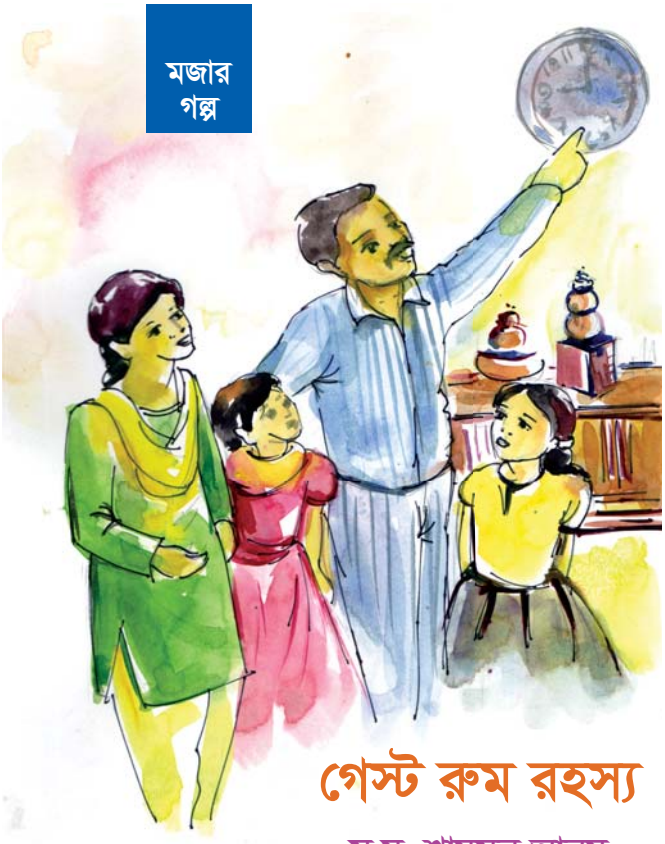

গেস্ট রুম রহস্য

স.ম. শামসুল আলম

আমাদের আব্বু মজার মানুষ। সব সময় মজা করেন। আমরা আব্বুর কথা শুনে হেসে খই ফোটাই। আজ রাতের খাবার খেতে বসেছি সবাই। সবাই মানে বড়ো আপু অর্ণা, আমি পর্ণা, ছোটো বোন ঝর্না আর আম্মু। কাজের মেয়ে রুমালি সাহায্য করছে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে। আমি ক্লাস সেভেন, আপু নাইন আর ঝর্না থ্রি-তে পড়ে। আমরা তিন বোন আনন্দ করলেও তিনজনের তিন মেরুতে অবস্থান। আপু ফেসবুক, আমি অ্যানিমেশন ছবি আর ঝর্না গেম পছন্দ করে। কিন্তু আব্বু যে সময়টুকু সঙ্গ দেন সে-সময়টুকু আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। আব্বু খেতে খেতে বললেন, আজ তোমাদের একটা মজার জিনিস দেখাব।

: কোথায় দেখতে পাব, কখন? উৎসুক হয়ে বলি আমি।

: আমাদের গেস্ট রুমে। খাবার পর দেখাব।

আব্বু এমন গম্ভীর হয়ে কথাটি বললেন যেন সিরিয়াস কিছু। কিন্তু আমি ধরেই নিচ্ছি আব্বু আজও ফান করছেন। আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও থেকো– সবারই দেখা জরুরি।

আম্মু মুচকি মুচকি হাসেন। তবে কী আম্মু আগে থেকেই জানেন কী দেখানো হবে? রুমালি গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, অমিও কী দেখতে যাব খালুজান?

ওর কথায় সবাই হেসে উঠি। আব্বু বলেন, অবশ্যই যাবি, তোকেই তো বেশি করে দেখতে হবে। কারণ তুই যাতে ওটা দেখার পর টিভিতে বাংলা সিনেমা কম দেখিস।

মুখটা একটু বেজার করল রুমালি। আমরা মুখ টিপে হাসি। রুমালি চলে যায়। রান্নাঘরে যেতে ও যে চুপিচুপি গেস্ট রুমের দিকে গেল তা সবাই বুঝতে পারলাম। তার মানে রুমালি সবার আগেই দেখে আসবে ওখানে কী আছে। কিন্তু আমরা জানি অতিথি কক্ষে একটি খাট আর বিছানা-বালিশ ছাড়া তেমন কিছু নেই। তবে কী আব্বু লুকিয়ে কোনো কিছু এনে রেখেছেন? হতে পারে কঙ্কাল। প্লাস্টিক অথবা রাবারের কঙ্কালে রেডিয়াম দেওয়া আছে। ঘর অন্ধকার করলে সেই কঙ্কালটিকে ভয়ংকর মনে হতে পারে। আমাদেরকে চমকে দেবার জন্য আব্বু এমন কিছু একটা আনতে পারেন। কিছু অনুমান করতে পারছি না। আমার মতো আপুও চিন্তিত। বলে ফেলল, আব্বু জিনিসটা কি তোমার সায়েন্স ফিকশন গল্পের নায়ক?

: না রে মা, না। কোথায় সায়েন্স ফিকশন আর কোথায় গেস্টরুম? অত টেনশন করছিস কেন? ভয়ের কিছু নেই, আমি আছি না সাথে?

আব্বুর কথায় এবার রহস্যের গন্ধ। তিন বোনেরই ভয়টা যেন বেড়ে গেল। কারণ আব্বুর মাথায় কখন কী ঢোকে বলা মুশকিল। তিনি একটি বিদেশি সংস্থায় চাকরি করেন। বিদেশি বই পড়েন। বানিয়ে বানিয়ে আজগুবি গল্প লেখেন। আমি একটি গল্প পড়তে গিয়ে তো ভয়ে অস্থির। একটি কুচকুচে কালো ঘোড়া শূন্যে পা ফেলে হাজার কিলোমিটার বেগে ছুটছে। তা-ও আবার ঘন কালো অন্ধকারে। অন্ধকারের রং আর ঘোড়ার রং মিশে গেছে। কোনটা আধার আর কোনটা ঘোড়া চেনা যাচ্ছে না।

ঘোড়া ছুটছে। হঠাৎ সে পেল এক ভিনগ্রহের প্রাণীর দেখা। ঘোড়াটি বলল, কে হে তুমি প্রাণী?

প্রাণীটি বলল, আমি না-ঘোড়া না-মানুষ। আমার নাম ঘোনুষ।

: ঘোনুষ কোনো প্রাণীর নাম তা জানা ছিল না।

: আমার পূর্বপুরুষ ঘোড়া ছিল তা থেকে 'ঘো' আর তার পূর্বপুরুষ মানুষ ছিল তা থেকে 'নুষ'। এবার হলো তো 'ঘোনুষ'।

: তা হলে তো তুই ঘোড়ার মতো শক্তিশালী আর মানুষের মতো বুদ্ধিমান। তোর সাথে আমি কিছুতেই পারব না। তবুও তোর সাথে একবার লড়াই করে দেখতে চাই তুই সত্যিই ঘোনুষ বংশের কেউ নাকি।

এমন সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো এবং পাঁচ রঙের ঘোনুষের সাদা দাঁতগুলো পঞ্চাশ ফুট লম্বা দেখা গেল।

এরকম একটি গল্প পড়ার পর আমি আর অর্ণা আপু আব্বুকে হাজারটা প্রশ্ন করেছিলাম।

: ঘোড়ার রং কালো তা মেনে নিলাম। কিন্তু মাটিতে যদি পা না রেখে চলে তবে তো ছুটে চলা বলা যায় না। উড়ে চলে বললে কী ক্ষতি হতো?

আব্বুর উত্তর : গল্পের ঘোড়া ছুটে চলাও যে কথা উড়ে চলাও সে কথা।

আমাদের প্রশ্ন : হাজার কিলোমিটার ঘোড়ার গতি সম্ভব কী?

আব্বুর উত্তর : আমি তো লিখিনি প্রতি ঘণ্টায়– এক হাজার কিলোমিটার এক মাসেও হতে পারে। এটাই রহস্য।

আমাদের প্রশ্ন : ঘোনুষের দাঁত পঞ্চাশ ফুট লম্বা হলে ঘোনুষ কত ফুট লম্বা?

আব্বুর উত্তর : পাঁচ ফুটও হতে পারে, সাত ফুটও হতে পারে। ঘোনুষের উচ্চতা গল্পের কোথাও লেখা নেই। তবে তোমরা যে দাঁতের কথা বলছ সেটা অনুমান করার বিষয়। কারণ সেখানে বিদ্যুৎ চমকানোর কথা ছিল। বিদ্যুতের ঝলক দাঁত বরাবর ধরলে পঞ্চাশ ফুট হয় নাকি পাঁচশ ফুট হয় তা কে মেপে দেখেছে?

আব্বুর এমন কথা শুনে আমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি। আব্বুর লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির কাছে আমরা পরাজিত।

রুমালি খাবার টেবিলের কাছে এলে আম্মু বললেন, তুই তাহলে আগেই দেখে এলি গেস্ট রুমে কী আছে?

: কী যে কন খালাম্মা, খালুজানের জিনিস আমি কেমনে চিনুম। ঐ দিকে গেছিলাম বিছানাডা গোছানোর জন্যি।

ওর কথায় আমাদের সবার হাসি পায়। আব্বুও মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। খাওয়া শেষ করে আমরা নিজ নিজ চেয়ারে বসে থাকি। আব্বু আমাদেরকে গেস্ট রুমে নিয়ে যাবেন সেই প্রতীক্ষায়। ঝর্না বলল, আব্বু গেস্ট রুমে নিয়ে যাচ্ছ না যে।

: একটু দেরি করছি। রহস্যটা বাড়ুক। সকলের মনের মধ্যে একটা অজানা রহস্য ঘুরপাক খেতে থাক।

আম্মু বললেন, এতটুকু সব মেয়েদের কাছে এত গুরুগম্ভীর কথা কেন যে বলো।

আব্বু বললেন, না, এটা তোমার ভুল ধারণা। আমার তিনটি মেয়ের কেউ এখন ছোটো নেই। ওদেরকে আমরা কেন ছোটো রাখব? ওরা অনেক বড়ো। প্রত্যেকটি শিশুই অনেক বড়ো। কারণ শিশুদের অন্তরে স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্নের সমান একটি বড়ো মানুষ কখনো হয় না।

ঝর্না বলল, আব্বু, আমিও ছোটো না?

: তুমি ছোটো, তবে যতটা ভাবছ, অতটা না। তুমি পড়ালেখা করো না?

: করি।

: গেম খেলো না?

: খেলি।

: তাহলে ছোটো বলি কীভাবে?

সবাই আব্বুর দিকে মনোযোগ দেই। আব্বু বলেন,

আজকাল পত্রিকায় ব্লু হোয়েল নামে একটি গেম নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। বাংলায় বলা হচ্ছে নীল তিমি। এই নীল তিমির খপ্পরে যাতে কেউ না পড়ে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

অর্ণা আপু বলল, কিন্তু আব্বু, পত্রিকায় যতটা লিখেছে সব সত্য নয়।

: সেটা আমিও জানি। তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অনেক শিশু-কিশোর ফেসবুকে বা গেম খেলে প্রচুর সময় নষ্ট করছে। আনন্দের জন্য সবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা হতে হবে প্রয়োজনমাফিক। কথায় আছে, অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

আমার ও আপুর মুখ একটু শুকিয়ে গেল। কারণ আমরা দুজনেই কম্পিউটারে বেশ সময় ব্যয় করি। আব্বু খুবই মজা করে করে সময় সম্পর্কে জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আব্বু তার গল্পের নায়ক নিজেই। আমি বললাম, আব্বু তুমি কিন্তু তোমার সায়েন্স ফিকশনের গল্পে ঢুকে যাচ্ছ। গেস্টরুমে কী যেন দেখাতে চেয়েছিলে।

: হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাব। চলো সবাই।

সবাই আব্বুকে অনুসরণ করে গেস্টরুমে গেলাম। আব্বু সুইচ অন করে বাতি জ্বালালেন। বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

আমরা চারদিকে তাকিয়ে তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। কারণ ঘরটিতে প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া তেমন কিছুই দেখা গেল না। আব্বু এবার চোখ ফিরিয়ে দেয়াল ঘড়িটি দেখালেন। বললেন, এই ঘড়িটি দেখতে পাচ্ছ?

: হ্যাঁ। বলল ঝর্না।

: এবার দেখ সেকেন্ডের কাঁটা একমনে ঘুরছে। কত দ্রুত। তাই না?

: হ্যাঁ। বলল অর্ণা আপু।

: তাহলে এবার চলো যার যার ঘরে যাই।

আব্বুর মুখে তৃপ্তির হাসি। যেন সারা দুনিয়ার রহস্য তিনি এক সেকেন্ডে দেখিয়ে দিয়েছেন। আম্মু বললেন আব্বুকে, তোমার রহস্যের ঢং দেখে আর বাঁচি না। দেয়াল ঘড়ি তো ডাইনিং রুমেও ছিল। ওখানে বসেই সেকেন্ডের কাঁটা দেখাতে পারতে।

আব্বু হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন, তাহলে কি রহস্যের গন্ধ পাওয়া যেত?

আমি আর ঝর্না একরুমে থাকি। অর্ণা আপু অন্যরুমে। আগে ঝর্না আব্বু-আম্মুর রুমে থাকত। এখন আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। আমি ঝর্নাকে কাছে বসিয়ে আব্বুর দেখানো সেকেন্ডের কাঁটার কথা ভাবছি। এমন সময় অর্ণা আপু এল। দেখি তার চোখ ছলছল। আপু বলল, জানিস পর্ণা, আজ আমি নতুন করে ভাবতে শিখলাম।

: কী বিষয়ে আপু?

: সময়। আমি কত সময় যে অকারণে ব্যয় করেছি তার হিসাব নেই। ফেসবুকও খারাপ না যদি সময় মেপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমি বোধ হয় একটু বেশি সময় দিয়ে ফেলেছি। আমি আর আমার কথা বলি না। চেপে যাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি অ্যানিমেশন আর কার্টুনের পেছনে এত সময় দেবো না। পড়ালেখার জন্য অধিক সময় দেওয়া জরুরি।

পরদিন সকালে দেখি আব্বুর লেখা গল্পটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। 'ঘোনুষ' নামের গল্পটি আমরা তিন বোন বসে পড়লাম। 'ঘোনুষ' পড়ে মানুষ হবার চিন্তা বেড়ে গেল। গল্পের শেষ দিকে আব্বু লিখেছেন বিজ্ঞানীরা নতুন করে অরেকটি গ্রহ আবিষ্কার করেছে। গ্রহটির নাম ধ্বংস। ধ্বংস গ্রহটি পৃথিবীর দশগুণ বড়ো। এই গ্রহটি নাকি শুধুই পৃথিবী নয়, অন্যান্য সকল গ্রহ ধ্বংস করে দিবে। সে নাকি একাই টিকে থাকবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। প্রথমে ধ্বংস করবে পৃথিবী। এই কথা শুনে ঘোনুষ সাত আসমানের মাঝখানে অর্থাৎ সাড়ে তিন আসমান উপরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকল। ঘূর্ণনকালে ধ্বংস গ্রহের সাথে পৃথিবীর টক্কর লাগবে এবং সাথে সাথেই পৃথিবী শেষ। টক্কর লাগার মুহূর্তে ঘোনুষ ধ্বংসকে সজোরে ধাক্কা দিল। ধ্বংস টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাত সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস সময়মতো কালো ঘোড়াটি ঘোনুষকে ধ্বংসের সংবাদ দিতে পেরেছিল।

আমার কিছু কথা আছে...

আমার খুব ইচ্ছে করে সুন্দর করে কথা বলতে। গড়গড় করে ঠিকঠাক কথা যারা বলেন, আমার খুব ভালো লাগে তাদেরকে। আমি যদি তাদের মতো কথা বলতে পারতাম। স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থাপনাও করে অনেকে। আমি সাহস করে যোগ দিতে পারি না, যদি কথা বলতে না পারি! কী করে এই ভয় কাটাব, যদি বলতেন!

— রুম্মান আজাদ, অষ্টম শ্রেণি

নবারুণ: বন্ধু রুম্মান, তুমি এত সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেছ! মনে হচ্ছে, তুমি একটু চেষ্টা করলেই কথাও গুছিয়ে বলতে পারবে। তোমাকে ডেল কার্নেগির কথা বলছি। তাঁকে বলা হয় সর্বকালের সেরা বক্তা। অথচ প্রথম যেদিন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, দর্শকরা ডিম ছুড়ে অপমান করেছিল। দুই মিনিটের বেশি থাকতে পারেননি মঞ্চে। তাই বলে থেমেও থাকেননি। শুরু করেছিলেন কথা বলার অনুশীলন। রাতের বেলা রাস্তায় ল্যাম্প পোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা কথা বলতেন। একদিন ঠিকই হয়ে উঠলেন তুখোড় বক্তা। ডেল কার্নেগির মতো তুমিও পারবে। তার জন্য অনুশীলন শুরু করে দাও আজ থেকে। আর পড়ে নাও নিচের লেখাটি, শিখে নাও দারুণ সব কৌশল। শুভ কামনা রইল।

বিতর্ক, বক্তৃতা ও উপস্থাপনার
কথা-কৌশল

নাজমুল হুদা

টেলিভিশনের পর্দায় যখন তোমারই বয়সি কেউ বিতর্ক করে কিংবা স্কুলের অনুষ্ঠানে সুন্দর কথার কারুকার্যে মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা করে তখন নিশ্চয় তোমারও মন চায় ইশ আমি যদি এভাবে কথা বলতে পারতাম। আচ্ছা আমি কি পারব অত সুন্দর করে কথা বলতে?

এরকম প্রশ্ন তোমাদের অনেকের মনেই উঁকি দেয় নিশ্চয়। তোমার কথা শুনে যদি সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাত তাহলে কতই না ভালো লাগত, তাই না?

কে না চায় সুন্দর করে কথা বলতে? যে-কোনো আয়োজনে যুক্তি-তর্কে কথার কারুকার্যে মাতিয়ে তুলতে চাই সাহস, দরকার একটু উদ্যোগী হওয়া। আর সাথে নিয়মিত অনুশীলন। ঘরে বাইরে অনুষ্ঠান আয়োজনে দশ জনের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলার জন্য জেনে নিতে পারো দশ কথা-কৌশল:

১. স্কুলে খোঁজ নাও। বিতর্ক ক্লাবে নাম লেখাও। শুরু করো নিয়মিত চর্চা। ও হ্যাঁ, তোমার স্কুলে যদি বিতর্ক বা বক্তৃতার জন্য কোনো ক্লাব না থাকে তাহলে আগ্রহীদের নিয়ে তুমি নিজেই গড়ে তুলতে পারো একটি প্ল্যাটফরম। এতে নেতৃত্ব গুণ ও সাংগাঠনিক

দক্ষতা বাড়বে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা বড়োদের পরামর্শ নিতে পারো।

২. বক্তৃতার ঢং-এ কথা বলতে যেও না। সহজ করে কথা বলার চেষ্টা করো শ্রোতারাও সহজে গ্রহণ করবে। ঐ যে কবি রবি ঠাকুর বলেছিলেন 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। তাই যদি নিজের মতো সহজ করে কথা বলার অভ্যাস করতে পারো তবে সবাই শুনবে। তবে মুখের মৃদু হাসিটা যেন থাকে। সহজ ও সরস করে বলার জন্য হাসিটা 'টনিক' হিসেবে কাজ করে।

৩. বিতর্ক বা বক্তৃতা যা-ই হোক বাড়তি চাপ নেওয়ার দরকার নেই। এতে ফলাফল উলটো হবে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পুরস্কার জেতার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে যতটা সম্ভব বিষয় বুঝে প্রস্তুতি পাকা করে নাও। নিজের প্রস্তুতি ভালো থাকলে অবশ্যই 'দেখা হবে বিজয়ে'।

৪. কথা বলার সময় সামনে কারা, কতজন বসে আছে তা ভেবে বিচলিত হবে না। কোথাও বক্তব্য দেওয়ার আগে দর্শক-শ্রোতা চিনতে শেখো। তাদের রুচি, চাহিদা অনুযায়ী আগে থেকেই প্রাসঙ্গিক কথা সাজিয়ে নাও। সবাই শুনবে। তুমি কথা বলছ অথচ কেউ ঠিকমতো না শুনে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এটা নিশ্চয় তুমি চাও না।

৫. একজন হকার, ম্যাজিশিয়ান, ভালো অভিনেতা বা বক্তা কীভাবে কথার জাদুতে সবাইকে মোহিত করে! কথার কারুকার্যে আসর মাত করে তোলে তা খেয়াল করো, শেখো। তবে অনুকরণ করতে যেও না। নিজের ভিতরের শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল আয়ত্তে আনার চেষ্ট করো ধীরে ধীরে। তুমিও একদিন ভালো বক্তা হয়ে উঠবে।

৬. সুন্দর কথা বলার পূর্বশর্ত শুদ্ধ উচ্চারণ। বাংলা বা ইংরেজি যে-কোনো ভাষায় ভালো বক্তব্য দেওয়ার জন্য আঞ্চলিকতা পরিহার করে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা জরুরি। ভয়ের কিছু নেই। এটি জন্মগত নয় বরং ধারাবাহিক চর্চার বিষয়। প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক বই পড়ে, ভিডিও দেখে বা পারদর্শী কারো পরামর্শ নিয়ে নিজেকে শাণিত করো।

৭. প্রস্তুতি ভালো থাকলে আত্মবিশ্বাসটা অনেকখানি বেড়ে যায়। এজন্য পড়াশোনা ও অনুশীলন জরুরি। পাঠ্য বইয়ের বাইরে পড়তে হবে বই, পত্রিকা, সাময়িকী। বাড়তি পড়ার অভ্যাস, রেডিও টেলিভিশনে খবর বা আলোচনাভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখার অভ্যাস থাকলে বক্তব্য বা বিতর্কের জন্য শব্দ বাছাই ও প্রয়োগ করা যায়।

৮. দৈনন্দিন ছোটো খাটো সমস্যা নিয়ে ভাব, নিজেই সমাধানের পথ খোঁজো। পাশের বন্ধু, সহপাঠী, পরিবারের সদস্য বা পরিচিত যে কারো কাছ থেকেই ভিন্ন কিছু শিখতে চেষ্টা করো। তাদের আবেগ, আচরণ, কথা-কৌশল খেয়াল করো, বিশ্লেষণ করো। এতে তোমার যুক্তিবোধ বৃদ্ধি পাবে। আর জানতো বিতর্কের মঞ্চে তোমাকে যুক্তিযুদ্ধে জয়ী হতে হবে।

৯. মনের সবকটি জানালা খুলে দাও। ভাবনার জগৎ প্রসারিত করো। চারিদিকে কী হচ্ছে, কী চলছে তা জানার চেষ্টা করো; বিশ্লেষণ করো। এরপর অপ্রয়োজনীয় তথ্য মস্তিষ্কে ঝেড়ে ফেলো। যে-কোনো সভা, সম্মেলন, অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে সেখানেও দেখবে পেয়ে যাবে অনেক উপাদান। এতে তোমার সম্পাদনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যুক্তি নির্ভর ভালো স্ক্রিপ্ট তৈরিতে কাজে লাগবে। আর ভালো স্ক্রিপ্ট হাতে থাকলে ভালো বক্তব্য দেওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অনুশীলন করো। নিজের অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর এর তারতম্য বা ভারসাম্য নিজেই টের পাবে। হাতের স্মার্ট ফোনটাও কাজে লাগাতে পারো। নিজের বক্তব্য রেকর্ড করে দেখলে ভালো একজন বক্তা বা বিতার্কিক বা উপস্থাপনা করা সহজ হবে।

স্কুলে প্রথম দিন

অর্ঘ্য দত্ত

মানুষের ছোটোবেলার সময়টা হলো শৈশব। আর সেই ছোটোবেলা মানুষের সবচেয়ে প্রিয়। কারণ ছোটোবেলার স্মৃতি সবচেয়ে মধুর। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'The golden period of time'। সত্যিই তো, এর চেয়ে স্বর্ণালি সময় জীবনে কারও কখনও আসে নি, আসবে বলে মনেও হয় না। কবি বোধহয় সে জন্যই বলেছেন, 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'!

অবশ্য এখনও আমার জীবনের বড়োবেলা শুরু হয়নি। তবু এখনকার চেয়ে আমি যখন আরও ছোটো ছিলাম, সেই সময়টা আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা। 'আমি যখন ছোটো ছিলাম' নামে আমার একটা ডায়েরি বই আছে। শুনেছি, সেটা আমার মুখেভাত অনুষ্ঠানে কোনো আংকেল উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছিলেন। বইটির পাতায়-পাতায় বিভিন্ন বয়সের ছবি আর হাতের ছাপ লাগানোর জায়গা করে দেওয়া আছে। ছোটোবেলায় আমি কোন্ বয়সে কেমন ছিলাম, কী করতে ভালোবাসতাম এ রকম অনেক তথ্য লেখা হয়েছে সেই বইয়ে। অর্থাৎ আমার বাবা-মা আমার বিভিন্ন বয়সে আমাকে দেখে ওই বইটার পাতাগুলো পূরণ করতেন। মাঝে-মাঝে ওই বইটা এখন দেখি আর মনে মনে হাসি, সত্যিই আমি অমন ছিলাম?

সত্যি কথা বলতে কী, ছোটোবেলার সব কথা কারোর মনে থাকে না। পরে বড়োদের কাছ থেকেই এগুলো জানতে হয়। আমারও এমন অনেক কথা আমি পরে বড়োদের কাছ থেকে জেনেছি। তবে একটা ঘটনার কথা আমার এখনও মনে আছে। আজ আমি সেই ঘটনার কথাই বলতে চাই। সেটা আমার স্কুলের প্রথম দিন। স্কুলের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সবার কিছু না কিছু মনে আছে। তেমনি আমারও আছে। আমাদের বাসার খুব কাছেই একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। একদিন সকালে বেশ সাজগোজ করে বাবার হাত ধরে সেই স্কুলে গেলাম। স্কুলে তখন ভর্তি চলছে। বাবা আমাকে ভর্তি করতেই স্কুলে নিয়ে গেলেন। স্কুলে যাবার আগে বাসায় বড়োরা কিন্তু ঠিক করেই রেখেছিলেন, আমাকে 'প্লে' গ্রুপে ভর্তি করা হবে। আমি এটা মানতে পারিনি। কারণ বাসায় 'অ আ' আর ইংরেজি 'এ বি সি ডি' পড়া অনেক আগেই শেষ করেছিলাম। আমার হাতে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' এসে গেছে। 'সহজপাঠ' থেকে 'কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি/বোঝাই করা কলসি-হাঁড়ি' কিংবা 'তিনটি শালিক ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে' আমি তখন মুখস্থ বলতে পারি। অথচ আমাকে কিনা ভর্তি করা হবে 'প্লে' গ্রুপে?

ছোটো বলে কিছুই বলতে পারিনি সেদিন। চুপচাপ বাবার হাত ধরে মাথা নিচু করে স্কুলে গেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বেশ ভালোভাবেই কথা বললেন। বাবার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কোন্ ক্লাসে ভর্তি হবো। বাবা বললেন, 'প্লে' গ্রুপে। প্রধান শিক্ষিকা তখন হেসে বললেন, দেখুন বেশি ছোটো বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করা যাবে না। কারণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে স্কুলে ভর্তি করা হলে বাচ্চার অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। তাই বাচ্চাটি স্কুলে ভর্তির উপযোগী কিনা সেটা যাচাই করে তবেই ভর্তি করা হয়। বাবার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে মনে আমারও ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল। কারণ বাসায় সবাই আমাকে 'প্লে' গ্রুপের উপযোগী মনে করেছিল। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আমাকে ভর্তির উপযোগীই মনে করছেন

না। আমি কি তবে এতই ছোটো? প্রধান শিক্ষিকা বাবাকে আশ্বস্ত করে বললেন, একটি ছোট্ট পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তখন আমার ভর্তির বিষয় বিবেচনা করা যাবে। কথা শুনে বাবা খুশি হলেন। মনে-মনে আমিও খুশি হলাম। যাক, পরীক্ষা দিয়ে একটা প্রমাণ করার সুযোগ তো হলো যে, আমি অত ছোটো নই!

প্রধান শিক্ষিকা আমাকে বাংলা বর্ণমালা 'অ' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত লিখতে বললেন। আমি 'অ' থেকে শুরু করে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত লিখলাম। এরপর আমায় ইংরেজি 'এ' থেকে 'ডি' পর্যন্ত লিখতে বলা হলে আমি 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত লিখলাম। অঙ্কের বেলাতেও তাই। আমাকে প্রশ্ন করা হলো 'দুই' আর 'দুই' যোগ করলে কত হয়? আমি বললাম, যোগ করলে চার হয় আবার গুণ করলেও চার হয়। এরপর দুইয়ের ঘরের নামতাটা শুনিয়ে দিলাম। দেখলাম, প্রধান শিক্ষিকার মুখে হাসি। বাবার শুকনো মুখেও হাসি ফুটেছে। প্রধান শিক্ষিকা বললেন, ওকে 'প্লে' গ্রুপে ভর্তি করাবেন কেন? ও 'নার্সারি' গ্রুপে ভর্তি হবার উপযুক্ত। তারমানে এক পরীক্ষাতেই 'প্লে' থেকে এক ক্লাস উপরে উঠে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, যাক এ যাত্রায় মান-সম্মানটা তবু রক্ষা হলো।

স্কুলে আসার আগে অবশ্য বড়োদের অনেকেই অনেক কথা বলেছিলেন। স্কুলের টিচাররা নাকি খুব রাগী হন। তাদের মুখে কখনো হাসি থাকে না। তাদের হাতে থাকে বেত। পড়া না পারলে কিংবা দুষ্টুমি করলে টিচারদের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। কঠিন শাস্তি পেতে হয়। তাই স্কুলে যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছিল, আমার মনে ভয় একটু একটু করে বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার স্কুলে ক্লাস করার প্রথম দিনটি ছিল খুব মজার। সেদিন খুব ভোরে মা আমাকে নতুন স্কুল পোশাকে সাজিয়ে দিলেন। অবশ্য এর আগেই স্কুলের ইউনিফর্ম বানানো হয়ে গেছে। নতুন কেনা জুতা মোজা আর স্কুল ইউনিফর্মে আয়নার সামনে সেদিন আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারিনি। তারপর মায়ের হাত ধরে কাঁধে বই-খাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে বাসা থেকে বের হলাম। মর্নিং শিফট ক্লাশ। স্কুল বাসার খুব কাছে বলে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম স্কুলে। সেখানে আমার মতো আরো অনেকে। সম্পূর্ণ অচেনা এক পরিবেশে প্রথমে একটু খারাপই লেগেছিল। তারপর সবাই মিলে যখন আমরা অ্যাসেম্বলির জন্য সারি বেঁধে দাঁড়ালাম, তখন বেশ ভালোই লাগছিল। জাতীয় সংগীত আমার আগেই জানা ছিল। তাই সবার সঙ্গে গাইতে কোনো অসুবিধা হলো না। তারপর প্রধান শিক্ষিকা আমাদের সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। এখন টেলিভিশনে জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখে আমার স্কুলের প্রথম সেই দিনটির কথা খুব মনে পড়ে।

নতুন ক্লাসরুমের অভিজ্ঞতাটাও চমৎকার! ক্লাসে ঢুকে দেখি সেখানে আমার নতুন বন্ধুরা বসে আছে। তার মধ্যেই আমি আমার জায়গা খুঁজে নিলাম। এরপর আমাদের ক্লাসটিচার এলেন। ও মা, ক্লাস টিচারের হাতে বেত কোথায়? তার মুখটাও তো গম্ভীর নয়। অথচ স্কুলে আসার আগে স্কুল সম্পর্কে কত আজেবাজে কথাই না শুনেছিলাম। এক মুহূর্তে আমার পুরনো ধারণাগুলো বদলে গেলো। ক্লাস টিচার আমাদের আদর করে অনেক কথা বললেন। স্কুলের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। এ দিন আমাদের কিছুটা পড়ালেনও। তবে কী পড়িয়েছিলেন, সেটা আর আজ মনে নেই। শুধু মনে আছে, এত ভালো ক্লাসে এসেও আমার বন্ধুদের কেউ কেউ রীতিমতো কান্নাকাটি শুরু করেছিল। যারা বেশি কান্নাকাটি করছিল, ক্লাসটিচার তাদের ছুটি দিয়ে দিলেন। তারা তাদের মায়ের সাথে বাড়ি চলে গেল। সেদিন আরো কয়েকটি বিষয়ের ক্লাস হয়েছিল। তারপর আমাদের ছুটি হলো। ছুটির ঘণ্টা বাজলে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে দেখি বাইরে মা অপেক্ষা করছেন। নতুন ক্লাসে এসে ভয় পাব অথবা কান্নাকাটি করব বলে মা স্কুলের সারাটা সময় ক্লাসের বাইরেই বসেছিলেন। কিন্তু আমি সেদিন একটুও ভয় পাইনি। এরপর কিন্ডারগার্টেন ছেড়ে হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। সেখানেও অনেক প্রতিযোগিতা, অনেক পরীক্ষা। কিন্তু সেদিনের পর থেকে স্কুল নিয়ে আমার মনে আর কোনো ভয় নেই। স্কুলকে এখন আমার বন্ধু মনে হয়।

৮ম শ্রেণি, সেন্ট গ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

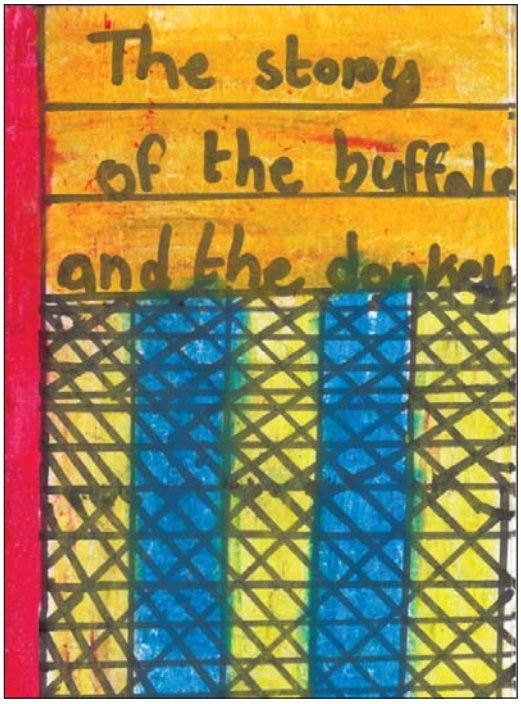

ষাঁড় এবং গাধার গপ্‌প

সুহাইবা সেলিম

একদিন নবারুণ হাতে পেল এক মজার বই। হাতে বানানো বই। ভেতরে হাতে লেখা মজার এক গপ্‌প। ভাষাটা ইংরেজি। তাতে কি? নবারুণ তোমাদের জন্য বাংলাতে অনুবাদ করে দিল। পড়ে দেখো তো, কেমন গপ্‌পটা?

একদা বাস করত এক রাখাল ছেলে। নাম তার মাহবুব। তার ছিল একটি ষাঁড় আর একটি গাধা। গাধাটা ছিল আলসে। ষাঁড়টা বেশ কাজ করত। একদিন মাহবুব ষাঁড়টাকে মাঠে নিয়ে গেল। তিরিশ মিনিট পর মাহবুব ঘুমাতে লাগল আর ষাঁড়টা খেতে থাকল ঘাস। কয়েক মিনিট পর ওরা দুইজন গেল বাড়ি। পরদিন ষাঁড়টার শরীর খারাপ হলো। তাই মাহবুব গাধাটাকে নিয়ে গেল মাঠে। মাহবুব এক গাছের ছায়ায় বসল। গাধাটারও খুব ঘুম এল বলে ও গেল বনের ভেতর। রাখাল ছেলেটা যখন জাগল, তখন গাধাকে দেখল না। ও অনেক সময় ধরে বসে রইল। তবুও গাধার কিছুই দেখা গেল না। মন খারাপ করে রাখাল তখন চলতে শুরু করল। তখন গাধাটাও বেরিয়ে এল। ওরা খুব জোরে ছুটতে লাগল, কেননা বন থেকে আসছিল এক বাঘ। আর যখন ওরা বাড়ি এল, তখন ষাঁড় বলল, 'বেঁচে গেছ। তুমি খুব, খুব, খুব ভাগ্যবান!'

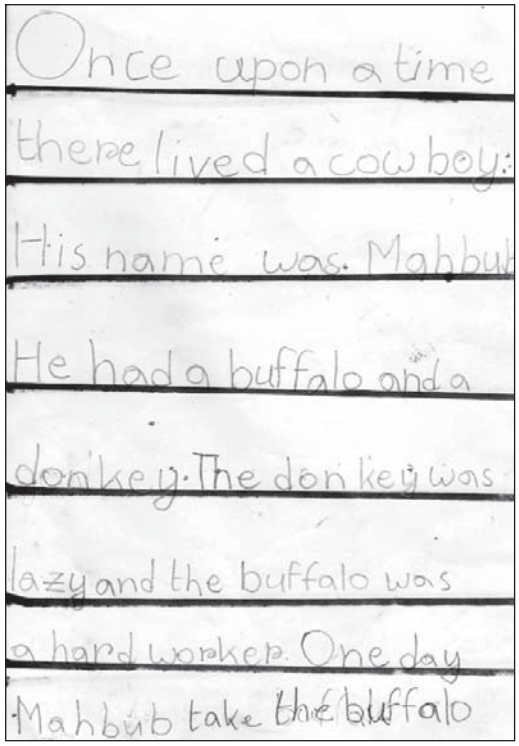
Once upon a time
there lived a cow boy.
His name was Mahbub
He had a buffalo and a
donkey. The donkey was
lazy and the buffalo was
a hard worker. One day
Mahbub take the buffalo

আর গাধা বলল, 'তোমার জীবন খুব কাজের, তা আমি এখন বুঝতে পারছি। কাল থেকে আমিও মাঠে যাব।' এরপর ওরা একসাথে ঘুমিয়ে পড়ল। রাখাল ছেলেটাও ঘুমালো। আর পরদিন একসাথে গেল আর খুব মজা করল।

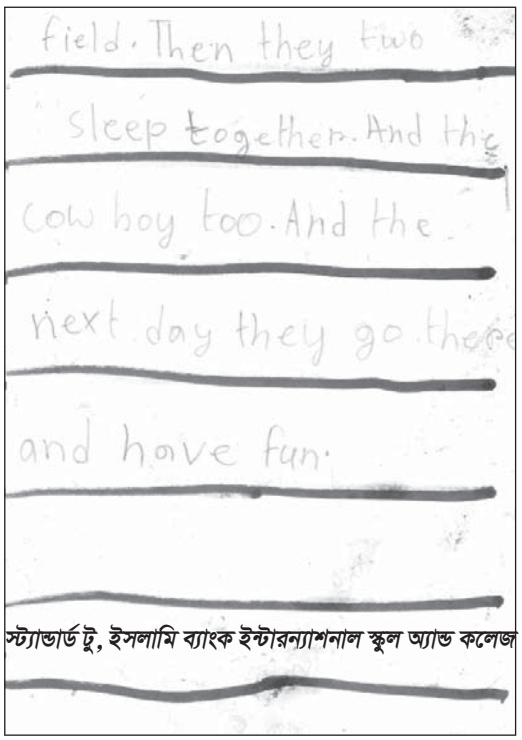
field. Then they two
sleep together. And the
cow boy too. And the
next day they go there
and have fun.

স্ট্যান্ডার্ড টু, ইসলামি ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মজার গল্প

খম্পুই

নাজিয়া জাবীন

দাদু হাটে যাবেন।

খম্পুই জুড়ে দিল কান্না, সেও হাটে যেতে চায়।

দাদুর কাছে গিয়ে বলে, আমি হাটে যাব দাদু।

দাদু কোনো কথা বলে না। খম্পুই যায় মায়ের কাছে। মা বলে, বাবাকে বলো।

বাবা মুচকি হেসে ছেলেকে বলে, এত দূর হাঁটতে পারবি?

খম্পুই মাথা নাড়ে। চোখ মোছে। চোখের নোনা পানি জিব দিয়ে চেটে খায়। এবার দাদু বলেন, বেশ তো! হাটে চল। এক কাঁদি কলা কিনে তোর মাথায় দেবো। সেই ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ফিরে আসবি ঘরে। পথে সন্ধ্যা নামলে শিয়ালের ডাকে ভয় পাওয়াও চলবে না।

খম্পুই তাতেও রাজি।

দাদা-নাতি চলল হাটে। পাহাড়ের উচুঁনীচু পথ বেয়ে এবার সে একটু ক্লান্ত। দাদুর কাছে ভান করে যেন এটা কিছুই না। দাদুও তা বুঝে না বোঝার ভান করে।

দূর থেকেই বোঝা গেল সামনে হাট। দূর থেকেই খম্পুই দেখে বলের দোকান। দাদুর হাত ছেড়ে দৌড় দিল সেখানে। লাল বলটা হাতে নিয়ে দাদুর কাছে বলটা চাইল সে।

দাদু বল কিনে দিলেন। এবার খম্পুই চায় বাঁশি। দাদু বাঁশি কিনে দিলেন। প্যাঁ পুঁ প্যাঁ--বাঁশি বেজে চলল।

এবার খম্পুই বলে চকোলেট চাই তার।

দাদু দুইটা চকলেট কিনলেন। একটা খম্পুই আর একটা টপ করে গেল দাদুর মুখে।

দাদু টুকটাক কাজ সারেন।

তারপর পাহাড়িয়া পথে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় ওরা। পথে প্যাঁ পুঁ পি পি বাঁশি বাজতেই থাকে। গাছের পাখিগুলো অবাক চোখে তাকায়।

সন্ধ্যে নামে নামে। তখন ওরা বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ল। খম্পুই ছুটে এল উঠোনে।

উঠোনে এসেই খম্পুই দাদুকে বলে, দাদু! তুমি এত মনভোলা কেন?

আমি আবার কী ভুলে গেলাম! দাদু যেন খুব অবাক হলো।

খম্পুই বলে, তুমি তো ভুলেই গেলে আমার মাথায় এক কাঁদি কলার ঝুড়ি দিতে।

দাদু বলে, তবে রে দুষ্টু, চল তবে ফের হাটে যাই।

খম্পুই একছুটে দৌড়ে যায় মায়ের কোলে।

মা আদর করে কোলে তুলে নেয় খম্পুইকে।

বেদে কন্যা সুমীর সফল হওয়ার গল্প

মোহাম্মদ সাজেদ

শান্ত স্থির নদীর উপর শাপলা ফুলের পাপড়ির মতো জোড়ায় জোড়ায় নৌকা বাঁধা। খালি চোখে দৃশ্যটি মনোমুগ্ধকর হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে শত বছরের, শত বঞ্চনার শিকার এক জনগোষ্ঠী। যাদের জন্ম এই নৌকায়, বেড়ে উঠা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন এই নৌকাতেই।

অনেকগুলো নৌকার মাঝে একটি নৌকাকে ঘিরে ছোটো ছোটো অনেকগুলো নৌকা ভিড় করছে। নৌকাটার আশপাশে অনেক উৎসুক শিশুর ভিড়। তাদের আগ্রহের যিনি কেন্দ্রবিন্দু, তার নাম সুমি।

সুমির জন্মও এই নৌকায়, বেড়ে উঠাও এই নৌকায়। তাহলে তাকে নিয়ে সবার এত আগ্রহ কেন? সবাই ভিড় করে দেখছে কেন?

কারণ, সুমি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ধবধবে একটা জামা পরে চুলে লাল ফিতা দিয়ে বেণি করছে।

এই নৌকায় যারা থাকে, তাদের কেউ স্কুলে যেতে পারে, এটা তাদের জানা ছিল না। তারা সুমির গায়ের জামার মতো জামা পরে পাড়ের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যেতে দেখেছে। কিন্তু তাদের নৌকা থেকে তো আগে কেউ কখনো যায়নি। নৌকার ছেলেরা বড়ো হলে বাবার সাথে মাছ ধরবে বা অন্য কোথাও যাবে কাজের সন্ধানে। আর মেয়েরা বড়ো হলে নৌকায় থাকবে। রান্নাবান্না করবে বা মায়েদের সাথে ফেরি করবে জিনিসপত্র, এটাই নিয়ম।

তাহলে সুমি কেন ভিন্ন কিছু করছে?

কারণ, সুমির পড়াশোনার প্রতি অদম্য আগ্রহ। তার একাগ্রতা জয় করেছে দারিদ্রতা, ভেঙেছে দীর্ঘদিনের অযাচিত নিয়ম। কীভাবে? বলছি শোনো।

ছোটোবেলা থেকেই সুমির পড়াশোনায় অনেক আগ্রহ ছিল। তাই দেখে তার বাবা-মা তাকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করায়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় সুমির স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের ঘণ্টা, সবুজ মাঠ, ক্লাস রুম সুমিকে খুব টানত। নৌকায় ভাত রান্না করতে করতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, ছেলে মেয়েদের স্কুলে আসা-যাওয়া। আফসোস করত, ইস! যদি সেও যেতে পারত স্কুলে।

একবার এক উন্নয়ন সংস্থা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করল। সুমি গেল সেই প্রশিক্ষণে। সুমির জানার আগ্রহ সবার নজর কাড়ল। সুমির খোঁজখবর নিল সংস্থাটি। সুমি পড়তে চায় কি না জিজ্ঞেস করল। সুমি তো পড়াশোনা শুরু করতে খুব আগ্রহী।

বাবা-মায়ের সাথে কথা বলা হলো। প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হলো। কিন্তু তখন ঝামেলা দেখা গেল স্কুলে ভর্তি নিয়ে। তিনমাস পর পিইসি পরীক্ষা। এই সময়ে নতুন করে কাউকে ভর্তি

করলে ফেল করে স্কুলের পাশের হার কমার ভয়ে কেউ ভর্তি করাতে চাচ্ছে না।

শেষমেষ একটা স্কুল রাজি হলো। হাতে সময় মাত্র দুই মাস। এরপরই হবে পিইসি পরীক্ষা।

দুই বছর পর সুমির হাতে বই। আবার স্বপ্ন দেখা।

আবার নতুন নতুন জিনিস শেখা।

দুই মাস পরে পরীক্ষা তো শেষ হলো, সুমির পড়াশোনায় ফিরে আসার আনন্দ, আবার রেজাল্টের জন্য ভয়-দুশ্চিন্তা মিলেমিশে একাকার।

আস্তে আস্তে সুমির রেজাল্টের দিন ঘনিয়ে এল। সুমি জিপিএ ৪.৮০ পেয়ে পাস করল। স্কুলের শিক্ষকরা তার জন্য গর্ব বোধ করল। সুমীর নৌকাপল্লি থেকে এই প্রথম কেউ এত ভালো রেজাল্টের সাথে প্রাইমারি স্কুল শেষ করল।

এরপর? সুমির গল্প কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি।

প্রতি বৃহস্পতিবার রেডিও বিক্রমপুরের নারীবিষয়ক অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সুমি। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্দর বাচনভঙ্গি, দীপ্ত কণ্ঠস্বর ও সাবলীল বলার ধরনে সুমি অনন্য। সুমির স্বপ্ন সুমি নিজের হাতে বাস্তব করে গড়ে তুলছে। বলছে, হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে।

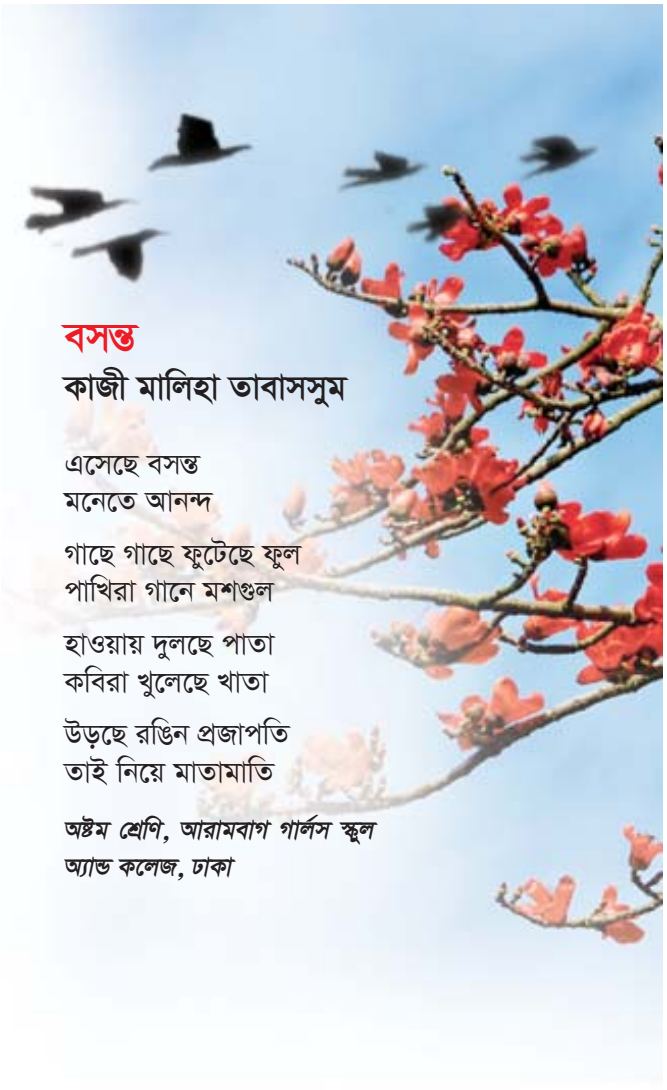

বসন্ত

কাজী মালিহা তাবাসসুম

এসেছে বসন্ত
মনেতে আনন্দ

গাছে গাছে ফুটেছে ফুল
পাখিরা গানে মশগুল

হাওয়ায় দুলছে পাতা
কবিরা খুলেছে খাতা

উড়ছে রঙিন প্রজাপতি
তাই নিয়ে মাতামাতি

অষ্টম শ্রেণি, আরামবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা